2 – year B. Ed Programme

Part – I

Paper II : Sociological Foundation of Education

UNIVERSITY OF BURDWAN
DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION
Golapbag, P.O – Rajbati,
Burdwan – 713104

পাঠ-প্রণেতা

ডঃ শাঁওলী চক্রবর্ত্তী
(একক- ৩,৪,৫)

বিভাগীয় প্রধান (বি.এড)
ডিরেক্টরেট অফ ডিসট্যান্স এডুকেশন,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক তারাপদ চ্যাটার্জী
(একক- ১,২,৬,৭,৮)

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
গলসী বি.এড. কলেজ, বর্ধমান।

যুগ্ম সম্পাদক

অধ্যাপক তুহিন কুমার সামন্ত

শিক্ষা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ শাঁওলী চক্রবর্ত্তী

বিভাগীয় প্রধান (বি.এড)
ডিরেক্টরেট অফ ডিসট্যান্স এডুকেশন,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থসত্ত্ব © ২০১৬

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান—৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

প্রকাশনা

ডিরেক্টর, দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

সম্পাদকের নিবেদন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে ১৯৯৪ সাল থেকে। আর দূরশিক্ষার মাধ্যমে বি.এড. চালু করার পরিকল্পনাটি রূপায়িত হয়েছে ২০১৪ সালে, যা দূরশিক্ষা অধিকরণের তথা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বড় প্রাপ্তি। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এই প্রচেষ্টা এই প্রথম। ভারতের মতো জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য এবং এই পেশামূলক কোর্সটির বিস্তার ঘটানোর জন্য এই কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বি.এড. কোর্সটি NCTE-র (National Council For Teacher Education) নিয়মানুসারে দ্বি-বার্ষিক কোর্স হিসাবে কার্যকরী হয়েছে। Part-I ও Part-II-এর চারটি করে আবশ্যিক পেপার এবং সর্বমোট ১২টি মেথড পেপারের পাঠ্যবিষয়গুলি যাতে ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজবোধ্য হয় এবং অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই যাতে তারা তা অনুধাবন করতে পারে, সেজন্য প্রতিটি পেপারের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যা কিনা সম্পূর্ণভাবে এখানকার পাঠক্রম অনুসারী। এই কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য দূরশিক্ষা অধিকরণ; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ এবং অন্যান্য অনুমোদিত কলেজগুলি থেকে দক্ষ অধ্যাপক/অধ্যাপিকা নিযুক্ত করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁদের কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

দূরশিক্ষা অধিকরণের অধিকর্তা ডঃ দেবকুমার পাঁজা মহাশয় এই কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনা করেছেন। উপ-অধিকর্তা শ্রী অংশুমান গোস্বামীর অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলেই কাজটি সংক্ষিপ্ত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তাঁদের উৎসাহ ও পরামর্শ প্রতি মুহূর্তে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে।

দূরশিক্ষা অধিকরণের অন্যান্য সকল আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও কর্মীদের সহযোগিতা অবশ্য-স্মরণীয় এবং সামগ্রিকভাবে সবক্ষেত্রে আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাই বি.এড.-এর দুইজন কোর-ফ্যাকাল্টি ডঃ সোমনাথ দাস এবং শ্রী অর্পণ দাসকে।

আগস্ট, ২০১৬

প্রফেসর তুহিন কুমার সামন্ত

ডঃ শাঁওলী চক্রবর্ত্তী

Contents

একক - ১ : শিক্ষার সামাজিক ভিত্তি ১

একক - ২ : জাতীয় কল্যাণের নিমিত্ত শিক্ষা ১৩

একক - ৩ : শিক্ষা ও আর্থিক বিকাশ ২১

একক - ৪ : শিক্ষা ও আধুনিকতা ৩৭

একক - ৫ : শিক্ষার বিভিন্ন রূপ ও সংস্থাসমূহ ৪৯

একক - ৬ : জনসংখ্যা শিক্ষা ৭১

একক - ৭ : পরিবেশমূলক শিক্ষা ৯০

একক - ৮ : ভারতীয় শিক্ষায় উদ্ভূত সমস্যাবলী ১০৭

একক : এক

শিক্ষার সামাজিক ভিত্তি

Sociological Basis of Education

বিষয়বস্তু

১.১ শিক্ষামূলক সমাজতত্ত্বের ধারণা এবং সামাজিক প্রক্রিয়া
(Concept of educational sociology and social process)

১.১.১ সমাজতত্ত্বের অর্থ ও পরিধি
(Meaning and Scope of Sociology)

১.১.২ শিক্ষামূলক সমাজতত্ত্বের ধারণা
(Concept of educational sociology)

১.১.৩ সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process)

১.২ প্রথা ও রীতিনীতির দিক থেকে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক
(Relationship between individual and society in terms of norms)

১.৩ সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষা
(Education as an agent of social change)

১.৪ শিক্ষা ও সংস্কৃতি (Education and culture)

১.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

১.৬ প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

১.৭ তথ্যসূত্র (Bibliography)

১.১ শিক্ষামূলক সমাজতত্ত্বের ধারণা এবং সামাজিক প্রক্রিয়া

১.১.১ সমাজতত্ত্বের অর্থ (Meaning of Sociology) :

শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের সমাজতত্ত্বের অর্থ ও পরিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

সমাজকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখাই হল সমাজতত্ত্ব। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক অগাষ্ট কোঁত সর্বপ্রথম তাঁর ‘Positive Philosophy’ গ্রন্থে ‘‘Sociology’’ শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁকে ‘সমাজতত্ত্বের জন্মদাতা’ (Father of Sociology) বলা হয়। তিনি সমাজ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে সমাজতত্ত্ব হল বিজ্ঞানের প্রয়োগগত দিক যার মাধ্যমে মানব প্রকৃতি ও সমাজের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে এমিল ডুর্কহেইম, ম্যাক্স ওয়েবার, কার্ল মার্কস, প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজতত্ত্ব আরো বিস্তার লাভ করে। তাঁদের মতে, ‘পরিবার থেকে রাষ্ট্র’ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পারস্পারিক সম্পর্ক বিচার বিবেচনা ও অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি সমাজতত্ত্বের মূল বিষয়। জার্মান দার্শনিক উইজীর মতে, যাবতীয় আন্তঃমানবিক সম্পর্কের বিজ্ঞান হল সমাজতত্ত্ব। আবার পার্ক সমাজতত্ত্বকে সমষ্টিগত ব্যবহারের বিজ্ঞান বলে মন্তব্য করেছেন। ডুর্কহেইমের মতে সমাজতত্ত্ব হল সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান। জোন্‌স আবার সমাজতত্ত্বকে ‘মানবিক সম্পর্কের’ আলোচনা বলেছেন। মার্কস বৈষয়িক উৎপাদন, শ্রেণীসংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় ও যে সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসের জন্ম হয় তাদের সকল কার্যক্রমকে সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে সমাজতত্ত্ব হল সমাজজীবনের একটি সামগ্রিক ছবি যা সংহতিপূর্ণ, ক্রিয়াশীল ও বোধগম্য। এর মূল বিষয় হল সামাজিকতা। বর্তমানে সমাজতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পৃথিবীর সব বিশ্বাবিদ্যালয়ে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সমাজতত্ত্বের পরিধি (Scope of Sociology) :

সমাজের মূল বিষয়বস্তু ব্যক্তি নয়, সমাজ। কারণ সমাজের মধ্যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, বড় হয় ও সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

সমাজতত্ত্ব সকল সমাজ বিজ্ঞানের মাতৃস্বরূপ - ‘Mother of all social science’.

এমিল ডুর্কহেইমের মতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সমণ্বয়ে সমাজতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। এগুলি হল -

(ক) সমাজ গঠন সংক্রান্ত বিদ্যা - সমাজের ভৌগলিক অবস্থান, লোক সংখ্যার ঘনত্ব, সমাজের আয়তন ইত্যাদি সমাজের গঠনে কি রকম ও কতটা প্রভাব বিস্তার করে।

(খ) সামাজিক শারীরবিদ্যা - সমাজের আচার ব্যবস্থার (ধর্ম, নীতি, আইন, ভাষা, রাজনীতি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা) প্রকৃতি ও উদ্ভব সংক্রান্ত অনুসন্ধান।

(গ) সাধারণ সমাজতত্ত্ব - সমাজের বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক পৃথকভাবে আলোচনা ও তাদের মধ্যেকার যোগসূত্র নির্ধারণ।

সুতরাং বলা যায়, সমাজেই ব্যক্তির উৎপত্তি ও এখানেই তার অর্ন্তনিহিত সম্ভাবনাবলীর বিকাশ ঘটে। সমাজের মধ্যেই মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে বেঁচে থাকে। সামাজিক সম্পর্কের অনুসন্ধান ও অনুশীলনই হল সমাজতন্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

আমেরিকার ম্যাডিসন ও উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন সংক্রান্ত সম্মেলনে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও ইতিহাসকে সমাজবিদ্যার অর্ন্তভূক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে সমাজতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র বিষয় যার কেন্দ্রে রয়েছে সমাজবদ্ধ মানবজীবন।

১.১.২ শিক্ষামূলক সমাজতত্ত্বের ধারণা (Concept of educational sociology) :

শিক্ষামূলক সমাজতত্ত্বের ধারণা হল ব্যক্তি ও তার সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে তারই পর্যবেক্ষণ শাস্ত্র। এটা হল সমাজতত্ত্বের একটি প্রয়োগমূলক শাখা। সমাজতত্ত্বের তথ্য ও নীতিগুলিকে শিক্ষার উপরিকাঠামো নির্মানে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 1917 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ওয়াল্টার স্মিথের ‘Introduction to educational sociology’ গ্রন্থে ‘Educational Sociology’ শব্দটি ব্যবহার করেন। শিক্ষা - সমাজবিজ্ঞান হল সমাজতত্ত্বের প্রয়োগমূলক দিক। ডুর্কহেইমের মতে, একটি বিশেষ সমাজের সুনাগরিক হয়ে ওঠাই হল ব্যক্তির জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য যা পূরণের সহায়ক প্রক্রিয়া হল শিক্ষা। ব্যক্তিকে সমাজ উপযোগী করে গড়ে তোলাই হল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। কার্ল ম্যানহেইন বলেছেন, শিক্ষা - সমাজবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটানো যা সমাজের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে। তাই বলা যায়, সমাজতত্ত্বের নীতি, পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক মনোভাব যখন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে বলে শিক্ষা - সমাজবিজ্ঞান। এফ.জে.ব্রাউন (F.J. Brown) এর মতে, শিক্ষা - সমাজবিজ্ঞান হল ব্যক্তির সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে অধ্যয়ন, যার অন্তর্ভূক্ত হল অন্যান্য ব্যক্তি, সামাজিক, গোষ্ঠী ও তাদের আচরণের বিন্যাস।

জর্জ গেইন বলেন, শিক্ষা - সমাজবিজ্ঞান হল সেই বিজ্ঞান যা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, দল ও প্রক্রিয়াবলির ও যেগুলির মাধ্যমে ব্যক্তি ও তার অভিজ্ঞতাবলি অর্জন করে ও যেগুলিকে সুসংগঠিত করে।

শিক্ষাক্ষেত্রের বিষয়বস্তু, ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষণ পদ্ধতি, বিদ্যালয় সংগঠন ও মূল্যায়ণ পদ্ধতিতে সমাজতত্ত্বের নীতি প্রয়োগ করেই এই বিষয়টিকে গড়ে তোলা হয়েছে। তবে Dan. W. Dadson বলেছেন, যে সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে ওপর মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জিত ও সুসংগঠিত হয়, তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে শিক্ষা সমাজবিজ্ঞান আগ্রহী। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে পূর্ণ পরিবেশের একটি অংশ হিসাবে দেখা হয়।

এ সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা থেকে আমরা শিক্ষা - সমাজবিজ্ঞানের কতকগুলি উদ্দেশ্য দেখতে পাই। এগুলি হল :

১. সামাজিক উন্নতির সহায়ক হিসাবে ও বিভিন্ন সামাজিক মতাদর্শের প্রতিফলনের স্থান হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের ভূমিকা উপলব্ধি করা।

২. প্রথাগত ও প্রথাবর্জিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পটভূমিতে গনতন্ত্রের আদর্শ, সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রবণতাগুলি উপলব্ধি করা।

৩. সামাজিক শক্তিগুলি ও ব্যক্তিবিশেষের ওপর সেগুলির প্রভাব উপলব্ধি করা।

৪. পাঠক্রমের সামাজিকীকরণ।

৫. উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযোগী বিশ্লেষণী চিন্তাধারা ও গবেষণা পদ্ধতি গড়ে তোলা।

শিক্ষা - সমাজবিজ্ঞানীদের লক্ষ্য শুধুমাত্র বিদ্যালয় নয়, তাঁরা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সমগ্র সমাজকে চিন্তা করে থাকেন।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে এর পরিধি সম্বন্ধে বলা যায় যে -

১) সমাজের প্রাথমিক উপকরণ, জনসমষ্টি, ভৌগলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানব প্রকৃতি ও তাদের সমস্যাবলী ও শিক্ষাক্ষেত্রে তার তাৎপর্য।

২) সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত অনুধাবন এবং তার প্রকারভেদ, বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তা কি ইঙ্গিত বহন করে।

৩) সামাজিক গঠন, সামাজিক দল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ও গোষ্ঠীর শিক্ষাক্ষেত্রে তাৎপর্য।

৪) সামাজিক গতিশীলতা, সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নতিবিধান ও এ প্রসঙ্গে শিক্ষার ভূমিকা।

৫) শিক্ষার গণতান্ত্রিক ভাবধারা।

সুতরাং বলা যায়, শিক্ষা - সমাজবিজ্ঞান তার সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত পদ্ধতি, নীতি ও গবেষণালব্ধ তথ্যাবলীকে শ্রেণীকক্ষে ও মানুষের সামগ্রিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এবং শিক্ষাকে সমাজ নিয়ন্ত্রণের সর্বাত্মক উপায় বলে মনে করে।

১.১.৩ সামাজিক প্রক্রিয়া (Social Process) :

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানুষ পর্যায়ক্রমে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করে সামাজিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয় তাকে সামাজিক প্রক্রিয়া বলে। প্রধানতঃ সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বজায় রেখে সামাজিক অগ্রগতিকে বাস্তবায়িত করাই হল সামাজিক লক্ষ্য। এর অর্থ প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংরক্ষণ, তাকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সঞ্চালন এবং সমাজের অগ্রগতি। শিক্ষা মোটামুটি এই একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই কোন কোন চিন্তাবিদ শিক্ষা বলতে সামাজিকীকরণকে বুঝিয়েছেন, কেউ কেউ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক রীতি নীতিকে পরবর্তী বংশধরদের হাতে সঞ্চালনকে বুঝিয়েছেন, আবার কোন কোন চিন্তাবিদ শিক্ষা বলতে জ্ঞান অর্জনকে বুঝিয়েছেন। এই কারণেই শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এখানে প্রক্রিয়া কথাটির মাধ্যমে ধারাবাহিকতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে শিক্ষা প্রক্রিয়া সামাজিক প্রক্রিয়ার অনুরূপ। এপ্রসঙ্গে একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন - জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন জীবনের প্রক্রিয়া অপরিহার্য, তেমন সমাজের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রক্রিয়া

অপরিহার্য। ফলে সমাজের মধ্যে যে প্রক্রিয়াগুলি দেখা যায় যেমন পারস্পারিক প্রতিক্রিয়া, সামাজিকীকরণ, বিরোধিতা, সহযোগিতা, সমণ্বয়, আত্মীকরণ ইত্যাদি শিক্ষাক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষা ও সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া : সমাজের কৃষ্টি সংস্কৃতি, আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদির সংরক্ষণ ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালন ও সমাজের প্রগতির অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিকীকরণ সম্পন্ন হয়। শিক্ষা ও তার পাঠক্রম ও সহ - পাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে এই কাজগুলি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করে থাকে। এই দিক দিয়ে বলা যায় যে সামাজিক প্রক্রিয়ার ন্যায় শিক্ষা প্রক্রিয়াও সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিক্ষা ও পারস্পারিক প্রতিক্রিয়া : যে সব পারস্পারিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজে যে ব্যক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠীর মনোভাব ও আচরণধারার মধ্যে স্থায়ী পরিবর্তন হয়, তাকে সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বলে। শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর আচরণ ও মনোভাবের স্থায়ী পরিবর্তন ও সঞ্চালন ঘটে পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে।

শিক্ষা ও সহযোগিতার প্রক্রিয়া : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা একটি সামাজিক গোষ্ঠীর মত বাস করে ও সহযোগিতার মাধ্যমে তারা পাঠক্রম ও সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী সম্পাদন করে, সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের কাজ ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে। তাই শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সহযোগিতামূলক সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষা ও বিরোধিতার প্রক্রিয়া : বিদ্যালয়ে সহযোগিতার পাশাপাশি বিরোধিতাও লক্ষ্য করা যায়। প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে বিরোধিতা প্রকাশ পায়। যেমন - পাঠক্রমিক ও সহ পাঠক্রমিক কার্যকলাপে পারদর্শিতা অর্জনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা যায়। শিক্ষা প্রক্রিয়া এই প্রতিযোগিতাকে উৎসাহদানের ফলে শিক্ষার্থীদের মেধা, ক্ষমতা ও পরিশ্রম করার ক্ষমতা ফলপ্রসু হয়ে থাকে। অপর দিকে দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দল ও উপদল সৃষ্টি হয় এবং তা অনেক সময় রেষারেষি, কলহ, মারামারিতে পরিণত হয়। বিদ্যালয়ে নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা থাকে। তাই বলা যায়, সামাজিক প্রক্রিয়ার ন্যায় শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান।

শিক্ষা ও সহাবস্থান : সমাজের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও বিরোধিতা ছাড়াও সহাবস্থান দেখা যায়। অভিযোজনে সহাবস্থান অপরিহার্য। শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে সহায়তা করা। তাই সামাজিক প্রক্রিয়ার মত শিক্ষা প্রক্রিয়ার ও একটি বৈশিষ্ট্য হল সহাবস্থান।

শিক্ষা ও আত্মীকরণ : শিক্ষার মধ্য দিয়েই আমরা বিভিন্ন দেশের সামাজিক রীতি নীতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হই এবং যেগুলি উত্তম সেগুলিকে নিজেদের মত করে গ্রহণ করি। এইভাবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমণ্বয় ও আত্মীকরণের প্রক্রিয়া ঘটে। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সমাজের পার্থক্যকে দূর করে আমরা এক বিশ্বব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হই। এক্ষেত্রে ইউনেস্কোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ্যনীয়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, সামাজিক প্রক্রিয়া ও শিক্ষা প্রক্রিয়ার লক্ষ্য অভিন্ন এবং সমাজের যে প্রক্রিয়াগুলি ক্রিয়াশীল, শিক্ষাক্ষেত্রেও সেই প্রক্রিয়াগুলিকে সক্রিয় হতে দেখা যায়। তাই বলা যায়, শিক্ষাও সম্পূর্ণভাবে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া।

১.২ নিয়মকানুন বা রীতি নীতির দিক থেকে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between individual and society in terms of norms) :

সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই মানুষ সংঘবদ্ধ হয় ও সমাজ গড়ে তোলে। সমাজ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলী বা সম্ভাবনাগুলির বিকাশে সাহায্য করে, তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয়।

সমাজে বসবাস করতে গিয়ে ব্যক্তিকে কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয় যেগুলি গোষ্ঠীর মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তির আচরণকে নির্দিষ্ট গোন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে। এই নিয়ম কানুন বা রীতিনীতি (Norms) সামাজিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। রীতিনীতি বা নিয়মকানুন ব্যক্তির আচার আচরণকে পরিচালনা করে এবং সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে। এগুলি মানুষের জীবনে নির্দেশক হিসাবে কাজ করে এবং তাকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে, তার দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেউ সামাজিক রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে অন্যের বিরাগভাজন হতে চায় না।

ব্যক্তির জীবনে এই সামাজিক নিয়মকানুনগুলি অপরিহার্য। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যক্তিকে অসংখ্য কাজ করতে হয় এবং চিন্তাভাবনা না করেই একাধিক লোকের সে ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করতে হয়। ব্যক্তির পক্ষে তার সমস্ত কাজকর্মের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা করা সম্ভব নয়। এইভাবে যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম নিয়ে চিন্তাভাবনা করি, যেমন - ঘুম থেকে উঠে কি কি করব, বাইরে যাব, হোটেলে বা দোকানে ঢুকবো, বাসে উঠবো, ব্যাঙ্কে যাব, বা কোন সরকারী অফিসে, এবং বন্ধু, ব্যাঙ্কের কর্মী, পুলিশ কর্মী, উকিল বা অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করব প্রভৃতি - এইভাবে চিন্তাভাবনা করলে আমরা কিছু সীমাবদ্ধ কাজকর্ম করতে সক্ষম হব। এখানে সামাজিক নিয়মকানুন আমাদের প্রয়োজনগুলিকে সীমাবদ্ধ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

সামাজিক নিয়মরীতি ছাড়া ব্যক্তির পক্ষে প্রতি মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সমস্যা দেখা দিত। যেমন - একজন শিক্ষার্থী ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে, প্রাত্যহিক কাজকর্ম সেরে জল খাবার খেয়ে পোশাক পড়ে নির্দিষ্ট সময়ে স্কুল বা কলেজে যায়, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করে, শিক্ষকদের পড়ানো শোনে, আবার সময়ে লাইব্রেরীতে পড়াশোনা করে, বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধূলা করে, নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি ফেরে, সন্ধ্যাবেলা পড়াশোনা করে ইত্যাদি। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর পক্ষে এই কাজগুলি পরপর করতে কোন সমস্যা হয় না, কারণ এই ক্রিয়াকলাপগুলি সামাজিক নিয়মরীতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান তার কাজগুলিকে সহজ করে দেয়।

এই সামাজিক নিয়মরীতি ছাড়া আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলি বিশৃঙ্খল, এলোমেলো এবং এমনকি বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে। সামাজিক নিয়মরীতি আমাদের সামাজিক জীবনে আদেশ, স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ হিসাবে কাজ করে। এগুলির অনুপস্থিতিতে ‘নৈরাজ্য’ (anomie) দেখা দেবে বলে ডুর্কহেইম মনে করেন। যেখানে সামাজিক নিয়মনীতি নেই সেখানে সমাজ গড়ে উঠতে পারে না।

১.৩ সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষা (Educatiion as an agent of social change) :

এটি খুবই পরিস্কার যে, কোন সমাজ সম্পূর্ণভাবে স্থির বা অপরিবর্তনীয় নয়। সমাজের মধ্যে যে কোন পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলা হয়। সমাজ জীবনে ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সব সময়ে এই ধরণের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। জিন্সবার্গের মতে, সামাজিক পরিবর্তন বলতে বোঝায় সামাজিক কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন এবং সংগঠনের শ্রেণির মধ্যে ভারসাম্যযুক্ত অবস্থা। কুপ্পুস্বামীর মতে, সামাজিক পরিবর্তন হল সামাজিক আচরণ এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন।

বিভিন্ন উপাদান সামাজিক পরিবর্তনে সাহায্য করে থাকে। যদিও সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, তবে সব পরিবর্তনকে ভালো বলে মনে করা যায় না। এইজন্য সমাজে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ডুর্কহেইমের মতে শিক্ষা নবীন প্রজন্মের সামাজিকীকরণ। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, মানসিকতা ও জীবনদর্শনের পরিবর্তন হয় এবং যা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক পরিবর্তন সাধন করে।

সামাজিক পরিবর্তন ও বিকাশের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষার ভূমিকা বর্তমানে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সামাজিক পরিবর্তন দেখা দেয় - (১) যখন মানব চাহিদার পরিবর্তন হয়, (২) যখন বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান মানবচাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয় এবং (৩) যখন নতুন উপাদান সমূহ মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য উন্নত পথের সন্ধান দেয়। সামাজিক পরিবর্তন নিজে নিজে ঘটে না। এপ্রসঙ্গে ম্যাকাইভার বলেছেন, যখন সামাজিক পরিবেশ ও সমাজ ভিন্ন অন্য পরিবেশে বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে তখন শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতার পরিবর্তন সমাজের রীতিনীতি, আচার, মূল্যবোধ, নৈতিকবোধ ও বিশ্বাসে পরিবর্তন আনে। শিক্ষাই মানুষের মনের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার দূর করে পরিমার্জিত, রুচিশীল আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

প্রাচীন গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের দায়িত্ব ছিল শিক্ষার্থীদের মধ্যে জীবনধারাকে সঞ্চালিত করা। তখন শিক্ষা বলতে বোঝাত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক পরিবর্তন নয়। কিন্তু বর্তমান আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জীবনধারার সঞ্চালনের ওপর একমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সাবেকী শিক্ষার অর্থ হল অপরিবর্তনীয় ও স্থির সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার লক্ষ্য হল গবেষণামূলক জ্ঞান অর্জন অর্থাৎ বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ ধরণের জ্ঞান অর্জন। সাবেকী শিক্ষা ছিল ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত আর বর্তমান শিক্ষা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। এখন শিক্ষা একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। এই কারণে শিক্ষাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হয়।

সমাজ জীবনের সমস্ত দিকের পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষা। ফ্রান্সিস.জে.ব্রাউন বলেছেন যে, শিক্ষা হল সেই প্রক্রিয়া যা সমাজের আচরণের মধ্যে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেক নাগরিক সমাজের প্রতি তার দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় এবং সমাজের বিকাশে নিজের অবদান রাখতে সাহায্য করে।

শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশেও শিক্ষা সাহায্য করে থাকে। শিশুর দৈহিক অর্থাৎ তার অর্ন্তনিহিত গুণাবলী ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্পন্ন হয়। শিশুর বৃদ্ধি ও শিখনের সময় তার চারপাশে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন বয়সের মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। সমাজ সর্বদাই পরিবর্তনীয়। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যাচ্ছে একদিকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে, অপরদিকে কৃষি নির্ভর অর্থনীতি শিল্প নির্ভর অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। এইভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে যা শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন দাবী করে। তাই শিল্পও অপরিবর্তনীয় হতে পারে না। আধুনিক বিশ্বের নতুন চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ও তার সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিবর্তন প্রয়োজন। শিক্ষা হল একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া যা সর্বস্তরের মানুষকে প্রভাবিত করে থাকে।

Peter Worsely বলেছেন যে, শিক্ষা প্রতিফলিত করে সমাজকে এবং শিক্ষার পরিবর্তনই সমাজের পরিবর্তন ঘটায়। সুপরিকল্পিত শিক্ষানীতি, গবেষণা ও পরীক্ষণ সামাজিক উৎকর্ষ ও সমণ্বয় সাধনে সাহায্য করে।

শিক্ষা সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যেমন ভারতের মত দেশে শিক্ষার বিস্তার হলে আশা করা যায় আরো বেশি সংখ্যক মানুষ রাজনৈতিক কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করবে, শিক্ষার্থীরা নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে।

শিশু শিক্ষক ছাড়াও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি যেমন অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্যদের দ্বারা শিক্ষালাভ করে থাকে। কিন্তু এইসব অভিজ্ঞতা থেকে অনেক সময় তার পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। তাই শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। শিক্ষা সমাজের প্রগতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সঞ্চালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষকের দায়িত্ব হল অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতাগুলি বর্জন করে শিক্ষার্থীর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। এইভাবে প্রথাগত, অপ্রথাগত ও প্রথা বর্হিভূত শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে কাঙ্খিত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সামাজিক পরিবর্তন আনতে শিক্ষা একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

১.৪ শিক্ষা ও সংস্কৃতি (Education and Culture)

আধুনিক সমাজব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি ধারণা হল ‘সংস্কৃতি’ (Culture)। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে এক সংজ্ঞায়িত করেছেন।

ইংরেজি ‘Culture’ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ ‘Colere’ থেকে। এর অর্থ হল কর্ষণ করা। সুতরাং সংস্কৃতি বা Culture হল কর্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়। সমাজতত্ত্ব সংস্কৃতি বলতে বোঝায় মানুষের বুদ্ধি, বিচার ও শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত মানব সম্পদকে। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য মানুষ নিত্যনতুন নানা ধরনের বৈষয়িক ও মানবিক সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে। ফলস্বরূপ চারুকলা, সঙ্গীত, প্রযুক্তিবিদ্যার উপকরণ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদির সাথে সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের অর্ন্তগত মানবিক সম্পদগুলি ও বিকশিত হচ্ছে। একদিকে পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ, অপরিদক সঙ্গীত, শিল্পকলা, সাহিত্য ইত্যাদি মানসিক প্রয়োজনীয়তা থেকে সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির অর্থাৎ এগুলির ধারক হল সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি বলতেও একটি সমাজের জীবনধারাকে বোঝায়। সামাজিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ললিতকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, আইন, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার, দক্ষতা, অর্জিত অভ্যাস-এসবই সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। সমাজবিজ্ঞানী জি.এম.ফসটার বলেন সমাজ মানে মানুষ, আর সংস্কৃতি মানে তাদের আচার আচরণ। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক জীবনযাত্রার অর্ন্তগত সবকিছুই সংস্কৃতি। মানুষের সব আচরণই সংস্কৃতির পরিচায়ক।

'সংস্কৃতি' ও 'শিক্ষা' নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। কারণ সামাজিক সংস্কৃতির মধ্যেই মানুষ শিক্ষালাভ করে। আবার বিদ্যালয়ের শিক্ষা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী তার সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হন। দেশের সংস্কৃতি থেকেই শিক্ষার বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়ে থাকে। শৈশব থেকেই শিশুকে যদি তার সামাজিক পরিবেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে না দেওয়া হয়, তবে তার পক্ষে ভবিষ্যতে সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষা ও সংস্কৃতি একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সংস্কৃতি বলতে মার্জিত রুচিও বোঝায়, আর তা গড়ে ওঠে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে।

বৃহত্তর অর্থে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সমার্থক। সংস্কৃতি একটি দেশের প্রতিচ্ছবি, যা একটি দেশকে বিশ্ব মাঝারে পরিচিত করে। শিক্ষার কাজ হল সংস্কৃতিকে পরিমার্জিত করা ও শিক্ষার্থীকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা। শিক্ষা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, আমি পারব - এই আত্মবিশ্বাস মানুষ প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করে। যেমন - এই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারাই ইউরোপ সমগ্র পৃথিবী জয় করেছিল।

এ প্রসঙ্গে বাট্রাড রাসেল বলেছেন - 'প্রকৃত সংস্কৃতি মানুষকে বিশ্ব জগতের নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলে, তা শুধুমাত্র একটি বা দুটি কালের ভগ্নাংশ মাত্র নয়'।

শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সমৃদ্ধিকরণ ও উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সঞ্চালন। এখানে সংস্কৃতির উপর শিক্ষার প্রভাব আলোচনা করা হল :

১) শিক্ষা সংস্কৃতির সংরক্ষণ করে - একটি শিশুকে সমাজে জন্মগ্রহণ করে ও সেখানেই বড় হয় ও সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। উত্তরাধিকার সূত্রেই সে সমাজ থেকে সংস্কৃতি প্রাপ্ত হয়। যে কোন সামাজিক জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যের এক অনন্য সমণ্বয় হল সেই সমাজের সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানবজীবনের একটি কাঠামো তৈরী করে ও শিক্ষা সেই কাঠামোকে উন্নত ও কাঙ্খিত পর্যায়ে নিয়ে যায়। শিক্ষার উপর যেমন সংস্কৃতির প্রভাব পড়তে বাধ্য ; তেমনি আবার সংস্কৃতির ওপর শিক্ষার প্রভাব আছে। তাই শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

২) শিক্ষা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে - মানুষ শুধু সাংস্কৃতিক সংরক্ষণই করে না, তার প্রবণতা হল সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিকরণ। প্রস্তর যুগ থেকে আধুনিক বিজ্ঞান নির্ভর সভ্যতার বিবর্তনই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শিক্ষার দ্বারাই সাংস্কৃতিক জীবনের সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

৩) শিক্ষা সংস্কৃতিকে দীর্ঘস্থায়ী করে - সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধিকরণের সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্থায়ী করতে হবে। মানুষের এই প্রবণতা আছে বলেই সংস্কৃতি চিরন্তন। পূর্বপুরুষদের প্রাপ্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সমাজ অনুমোদিত, স্বীকৃত, দীর্ঘকাল, ললিত আচার-আচরণ, সামাজিক মূল্যায়ণ, বিশ্বাস, আদর্শ ইত্যাদি নতুন প্রজন্মের কাছে সঞ্চালিত করা হয়। বলা যায়, শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির সঞ্চালন ঘটে।

৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কৃতির ধারক ও বাহক - মানব সমাজ সংস্কৃতি ধরে রাখার জন্য সামাজিক উদ্যোগ বিভিন্ন বিধিবদ্ধ, অবিধিবদ্ধ ও মুক্ত শিক্ষার সংগঠন গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সমৃদ্ধিকরণ ও সঞ্চালন করে থাকে। শিক্ষা এই সঞ্চালনের কাজ কতটা সার্থকভাবে করতে পারবে তার ওপর সমাজের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। শিক্ষা এই সঞ্চালনের কাজটি সম্পন্ন করতে না পারলে সেই জনগোষ্ঠীর অবসান তাদের সংস্কৃতির পরিসমাপ্তি ঘটে। যেমন - মিশর সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতার পতনের সাথে সাথে তাদের সংস্কৃতির পতন ঘটেছে।

শিক্ষা যেমন সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সমৃদ্ধিকরণ ও সঞ্চালন করে থাকে তেমন সংস্কৃতিও এমন এক ধরনের সামাজিক বিষয় যা শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হল সংস্কৃতি। মানুষের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হল শিক্ষা। মানুষ স্বয়ং সংস্কৃতির অন্যতম সম্পদ। কারণ বিশ্ব জগতে একমাত্র মানুষই তার সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে।

একজন ব্যক্তির আচরণ ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষা। আবার সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট আচরণধারা-কে মানুষ অনুসরণ করে। তাই শিক্ষা হল সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

প্রতিটি সমাজেই সংস্কৃতির মাধ্যমে মনোভাব, মূল্যবোধ, জীবনদর্শন ইত্যাদি নির্ধারিত হয়। শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে মনোভাব গঠনের সংস্কৃতির বাহকরূপে কাজ করে। পরিবর্তনশীল সংস্কৃতি শিক্ষার হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাই সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও পরিবর্তন ঘটে।

জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি, নতুন নতুন আবিষ্কার, চিন্তাভাবনা ও মতাদর্শ প্রভৃতির প্রভাব সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রবাহকে অব্যাগত রাখে। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ তার দেশের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। আবার সংস্কৃতির বিকাশকালেই সে তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সমৃদ্ধ করে তোলে। শিক্ষার নিয়ামক হিসাবে সংস্কৃতির এই ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের জাগতিক যাবতীয় কার্যকলাপ ও কর্মকুশলতা, ভাব-ভাবনা, ভাষা, সাহিত্য, আশা-আকাঙ্খা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, চারুকলা, দর্শন, জীবনচর্চা, আচরণ ধারা, যোগাযোগের উপায়, ন্যায় নীতি, মূল্যবোধ - সবই মানুষের সংস্কৃতির পরিচায়ক। আমাদের সমগ্র জীবনধারাই আমাদের সংস্কৃতির বাস্তব প্রকাশ।

মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে যা কিছু অনুশীলন করছে, আয়ত্ত করছে, শিখছে - সবই তার সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। মানুষের সামাজিক জীবনযাত্রার পদ্ধতিভুক্ত সব কিছুই তার সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে। প্রত্যেক সমাজের কৃষিকার্য, শিল্পোৎপাদন, চারুকলা, গৃহনির্মান, রন্ধন প্রণালী, আচার-অনুষ্ঠান, প্রজ্ঞা-প্রকরণ প্রভৃতি জীবনপ্রণালীর সব কিছুই সংস্কৃতির অর্ন্তভুক্ত। এদের সংস্কৃতির বহিরঙ্গও বলা হয়। এছাড়া সমাজস্থ মানুষ, রাষ্ট্রীয়, নৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল আদর্শ, মূল্যবোধ এবং নিয়মনীতি পালন করে সেগুলিও তার সংস্কৃতির দ্যোতক।

পাঠক্রম সংস্কৃতির সংকলন :

সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসারে পাঠক্রম প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। শিক্ষা পদ্ধতির বিষয়টিও সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় - ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে গুরু শিষ্যর সম্পর্ক শ্রদ্ধার। কিন্তু পাশ্চাত্য এই সম্পর্কটি বন্ধুত্বের - শিক্ষক হলেন বন্ধু ও পথ প্রদর্শক। শিক্ষালয়ের পরিবেশকেও নিয়ন্ত্রণ করে সংস্কৃতি।

সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নির্মান সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলি সহায়তা কর। যেমন - স্বাধীনতা দিবস, মহান ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ দিনগুলি বিদ্যালয়ে পালনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা দেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়। দেশের গৌরব গাঁথা ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করে ও তাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। প্রথাগত বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মুক্ত বিদ্যালয় এবং গণমাধ্যম ইত্যাদি অবশ্যই সাংস্কৃতিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত।

ভারতীয় সংস্কৃতির মূল আদর্শ হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য - যা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিফলিত। এই সংস্কৃতির প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ এই ঐক্যের আদর্শকে তাঁর বিশ্বভারতীতে বাস্তবায়িত করেছেন। সেই সঙ্গে এখানে সংস্কৃতির আর্ন্তজাতিকতার সংহতি সাধন ঘটছে। শিক্ষকদের দায়িত্ব হল ঐতিহ্যকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিত করা।

বর্তমান মানব ঐতিহ্যের সকল দিকগুলিই অবক্ষয়িত। তাই এই মুহূর্তে জরুরী হল সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বিন্যাসের ওপর বিশেষ ভাব গুরুত্ব প্রদান করা। এই ব্যাপার সকল শিক্ষা মাধ্যমগুলিকে সদার্থক ভূমিকা পালন করতে হবে এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সুষ্ঠু সমণ্বয় সাধন আবশ্যক।

১.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

সমাজকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখাই হল সমাজতত্ত্ব। যাবতীয় আন্তঃমানবিক সম্পর্ক, বিচার বিবেচনা ও অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী সমাজতত্ত্বের অন্তর্গত। সমাজতত্ত্ব হল সমাজবিজ্ঞানের মাতৃস্বরূপ। সমাজগঠন সংক্রান্ত বিদ্যা, সামাজিক শারীরবিদ্যা ও সাধারণ সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ সমণ্বয়ে সমাজতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। সমাজে ব্যক্তির উৎপত্তি ও সমাজেই তার অন্তর্নির্হিত সম্ভাবনাবলীর বিকাশ ঘটে। শিক্ষামূলক সমাজতত্ত্ব হল সমাজতত্ত্বের একটি প্রয়োগমূলক শাখা। ব্যক্তিকে সমাজুপোযোগী করে গড়ে তোলাই হল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষা-সমাজবিজ্ঞান হল ব্যক্তির সঙ্গে তার সংস্কৃতিক পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে অধ্যয়ন। শিক্ষা সমাজবিজ্ঞানের মধ্যেই ব্যক্তির, সামাজিক গোষ্ঠীর ও তাদের আচরণের বিন্যাস অন্তর্ভূক্ত। শিক্ষা সমাজবিজ্ঞানীরা বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সমগ্র সমাজের সামাজিকীকরণের প্রচেষ্টায় থাকেন এবং শিক্ষাকে সমাজ নিয়ন্ত্রণের সর্বাত্মক উপায় বলে মনে করেন। প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষণ, তাকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সঞ্চালন এবং সমাজের অগ্রগতি বজার রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হয়ে থাকে। এই কারণেই শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সমাজের উন্নয়ণের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রক্রিয়া অপরিহার্য। সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে সমাজ গড়ে তোলে। সমাজের রীতিনীতি সামাজিক মূল্যবোধের

উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সামাজিক নিয়মরীতি সামাজিক জীবনে আদেশ, স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসাবে কাজ করে। যেখানে সামাজিক নিয়মনীতি নেই, সেখানে সমাজ গড়ে উঠতে পারে না।

কোনো সমাজ সম্পূর্ণভাবে স্থির বা অপরিবর্তনীয় নয়। সমাজ জীবনে বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বেশিরভাগ সময়ই সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। সব সামাজিক পরিবর্তনকে ভালো বলে মনে করা যায় না। সমাজে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকেই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শিক্ষাই হল নবীন প্রজন্মের সামাজিকীকরণ। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশেও শিক্ষা সাহায্য করে। অর্থাৎ শিক্ষা হল একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া যা সর্বস্তরের মানুষকে প্রভাবিক করে থাকে। প্রথাগত অপ্রথাগত ও প্রথা বর্হিভূত শিক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ও কাঙ্খিত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, সামাজিক পরিবর্তন আনতে শিক্ষা একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

চারুকলা, সংগীত, প্রযুক্তিবিদ্যার উপকরণ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, শিল্পকলা ইত্যাদি মানুষিক প্রয়োজনীয়তা থেকে সৃষ্টি হয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে সামাজিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, অর্জিত অভ্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনধারাকে বোঝায়। সংস্কৃতি ও শিক্ষা নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। শিক্ষা যেমন সংস্কৃতির সংরক্ষণ সমৃদ্ধিকরণ ও সঞ্চালন করে থাকে তেমনই সংস্কৃতি শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নির্মানে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী সহায়তা করে। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল আদর্শ হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য-যা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়। বর্তমানে মানব ঐতিহ্যের সকল দিকগুলি ক্রমশ অবক্ষয়িত হবার ফলে বর্তমানল পরিস্থিতিতে সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সুস্থ সমণ্বয় সাধনের জন্য শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ও শিক্ষা মাধ্যমগুলির সদর্থক ভূমিকা পালন কাম্য।

১.৬ প্রশ্নাবলী ঃ (Questionnaire)

১) শিক্ষার সামাজিক ভিত্তিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২) শিক্ষামূলক সমাজতত্ত্বের ধারণা সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

৩) সমাজতত্ত্ব বলতে কি বোঝেন?

৪) সমাজতত্ত্বের পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫) শিক্ষামূলক সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার ধারণা লিখুন।

৬) সামাজিক প্রক্রিয়া বলতে কি বোঝেন?

৭) শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন কিভাবে সাধিত হয় লিখুন।

৮) শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করুন।

১.৭. তথ্যসূত্র : (Bibliography)

১) সমাজতত্ত্ব (পরিমূলভূষণ কর)

২) সমাজতত্ত্ব (অনাদি ভূষণ মহাপাত্র)

৩) Sociology (C.N. Shankarao)

একক : দুই

জাতীয় কল্যাণের নিমিত্ত শিক্ষা

Education as a means of national welfare

বিষয়বস্তু

২.১ উদ্দেশ্য (Objective)

২.২ সূচনা (Introduction)

২.৩ শিক্ষা হল জাতীয় কল্যাণের হাতিয়ার
(Education as a means of national welfare)

২.৪ শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন
(Education and human resource development)

২.৪.১ মানব সম্পদ বিকাশ সম্পর্কে ধারণা
(Concept of human resource development)

২.৪.২ শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিকাশের মধ্যে সম্পর্ক
(Relation between education and human resource development)

২.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

২.৬ প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

২.৭ তথ্যসূত্র (Bibliography)

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা -

- জাতীয় কল্যানের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক সম্পর্কে জানতে পারবে।
- মানব সম্পদের সংজ্ঞা সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠবে।
- মানব সম্পদের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক কি সে সম্পর্কে শিক্ষার্থী জানবে।
- কিভাবে শিক্ষা মানব সম্পদের বিকাশে সাহায্য করে সে সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠবে।

২.২ সূচনা (Introduction)

জাতীয় কল্যান বা উন্নয়নের জন্য শিক্ষা একটি হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে থাকে। শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য হল জাতীয় কল্যানে সহায়তা করা। শিক্ষা কিভাবে জাতীয় কল্যানে সাহায্য করে এবং ভারতীয় সংবিধানে এ ব্যাপারে কি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে সে ব্যাপারে এখানে আলোচনা করা হল।

২.৩. শিক্ষা হল জাতীয় কল্যাণের হাতিয়ার (Education as a means of national welfare):

প্রাচীন ও বর্তমান কালের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌রা জাতীয় কল্যানের জন্য শিক্ষার মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। জাতীয় উন্নয়ন বা কল্যান বলতে বোঝায় একটি রাষ্ট্রের সার্বিক বিকাশ ও কল্যান। এই বিকাশ হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই বিকাশ ও উন্নয়ন রাষ্ট্রের সর্বত্র সমানভাবে করতে হবে, যেন কোন অঞ্চল বা অংশ অনুন্নত থেকে না যায়।

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে, শিক্ষাই জনগণের জন্য সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিয়ে আসে। কোন দেশের সাফল্য, তার জনগণের জীবন-যাত্রার মান সেখানকার শিক্ষিত মানুষদের গুণগত মানের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। শিক্ষার বিস্তার, অর্থের বরাদ্ধ ও অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে যাতে কোন আঞ্চলিক বৈষম্য না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যথা জাতীয় সংহতিকে আঘাত করতে পারে।

শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল জাতির উন্নয়ন সাধন। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশরা যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল তার মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য এক অনুগত ভারতীয় সম্প্রদায় সৃষ্টি করা। ফলে শিক্ষাকে ভারতীয় উন্নতির জন্য ব্যবহার করা হয় নি। তাই স্বাধীনতার পরবর্তী সময় দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রক্রিয়ার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য হল জাতির উন্নয়ন। শিক্ষা জাতির উন্নয়নে যে সব দায়িত্ব পালন করে থাকে সেগুলি হল :

(i) ব্যক্তিকে তার পরিবেশ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে ও পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করে শিক্ষা। ফলে সে বুঝতে পারে যে এই পরিবেশের মধ্যে তাকে বেঁচে থাকতে হবে এবং জীবনযাপনের কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে হবে। তাই একদিকে যেমন পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে সক্রিয় হয় অপর দিকে পরিবেশের উন্নয়নে সে সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালায়।

(ii) শিক্ষা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সহজাত সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে। যার ফলে ব্যক্তি তার বিকশিত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নীতিবোধ, মেধা ও বুদ্ধি সমাজ ও দেশের কাজে নিয়োগ করে জাতির উন্নতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

(iii) শিক্ষা ব্যক্তির মেধা, বুদ্ধি ও প্রবণতাগুলির বিকাশে সাহায্য করে যা ব্যক্তির উৎপাদনশীলতাকে বৃদ্ধি করে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। তাই যে কোন দেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় করতে কার্পন্য করে না। কারণ এটা একধরণের বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগ মানব সম্পদকে যথাযথ ব্যবহার করে দেশের কৃষি, শিল্প ও বানিজ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। তাই দেখা যায় যে উন্নত দেশগুলি তাদের মোট ব্যয়ের একটি বড় অংশ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় করে।

(iv) শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি প্রতিটি ঘটনাকে কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং সেই জ্ঞানকে ভবিষ্যতে প্রয়োগ করতে পারে। এইভাবে দেশের প্রতিটি মানুষ শিক্ষিত হলে সমাজ, দেশ এবং জাতির কল্যাণ সম্ভব।

(v) গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের শিক্ষা লাভ বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ শিক্ষিত জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ জাগ্রত হলে তাদের পক্ষে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালন সম্ভব হয়। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সকলকেই শিক্ষার অধিকার প্রদান করতে হবে তবেই জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হবে।

(vi) শিক্ষার মাধ্যমেই একজন ব্যক্তির পক্ষে সুনাগরিক হয়ে ওঠা সম্ভব। উপযুক্ত শিক্ষা নাগরিককে তার অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। যার ফলে সে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(vii) সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী নাগরিক হল দেশ ও জাতির সম্পদ। শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা সম্পর্কিত তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তি লাভ করে।

(viii) নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও নানারকম অন্ধ-কুসংস্কার দেশের অগ্রগতিকে বাধার সৃষ্টি করে। শিক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের মাধ্যমে এই সমস্ত গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর করা সম্ভব এবং এর ফলে জাতির কল্যান সুনিশ্চিত হতে পারে।

(ix) ভারতবর্ষের মত দেশের জনগণের একটা অংশ দীর্ঘদিন নানারকম অন্যায়, অবিচার ও বঞ্চনার শিকার। এরাও দেশের মানব সম্পদের একটি অংশ। এদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে জাতির উন্নয়নে ব্যবহার করা সম্ভব এবং মানব সম্পদকে অপচয় থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

(x) যে সমস্ত মানুষ শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে আছে শৈশব থেকে তাদের যদি বিশেষ ধরণের শিক্ষা প্রদান করা হয়, তবে তারাও জাতির সম্পদ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এদের বিশেষ শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে এসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একসঙ্গে শিক্ষা লাভের সুযোগ দিতে হবে। এর ফলে তারাও দেশের উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে।

(xi) দেশের সৃজনশীল ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সৃজনশীল ব্যক্তিরাই তাদের নতুন নতুন চিন্তাধারার মাধ্যমে কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, প্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। যার ফলে শুধু সেই দেশ ও জাতিরাই কল্যাণ হয় না, সেই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের মানুষ উপকৃত হয়ে থাকে।

উপরে এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, দেশ ও জাতির উন্নতিকে সুনিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করতে শিক্ষার ভূমিকা সর্বাপেক্ষা অধিক। তাই ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে ২০০২ সালে ১২ই ডিসেম্বর ৮৬তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক আধিকারের মধ্যে ২১(ক) ধারায় বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন শিক্ষাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ২০১০ সালের ১লা এপ্রিল "Right to Education Act" আইনটি স্বীকৃতি পেয়েছে যা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন দিশা প্রদান করবে বলে আশা করা যায়।

২.৪. শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন (Education and Human Resource Development):

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির হাত ধরে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে এবং এর ফলস্বরূপ জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করছে। অন্যভাবে বলা যায়, এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফলগুলি মানুষের পক্ষে ভোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও সমাজবিদরা মনে করেন যে, এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতে না পারলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এই ধরণের চিন্তা ভাবনার ফলশ্রুতি হিসাবে 'মানব সম্পদ বিকাশ' সম্পর্কিত ধারণা গড়ে উঠেছে। এই মানব সম্পদের বিকাশ এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। তাই 'শিক্ষা' নামক পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে 'শিক্ষা ও মানব সম্পদের বিকাশ' নামে একটি নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে।

২.৪.১. মানব সম্পদ বিকাশ সম্পর্কিত ধারণা (Concept about Human Resource Development):

শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিকাশের সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের মানব সম্পদ ও তার বিকাশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। কোন বস্তু ও তার ব্যবহার যোগ্যতাকে সাধারণভাবে সম্পদ বলা হয়ে থাকে। যে কোন দেশে শুধুমাত্র কৃষিজাত বা খনিজ সম্পদের অস্তিত্ব থাকলেই চলবে না। যতক্ষণ না সেই সম্পদকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানো যাবে ততক্ষন তার কোন মূল্য থাকে না। সেইরকম মানুষ যখন তার বুদ্ধি, মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কোন উৎপাদনমূলক কাজে নিজেকে নিয়োগ করে তখন তাকে সম্পদ বলে।

মানব সম্পদ বিকাশ হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা তিনটি পরস্পর নির্ভরশীল উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত :

- উৎপাদনশীল সামর্থ্যের উন্নতির জন্য মানব সম্পদের মধ্যে বিনিয়োগ।
- উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেই মানব সম্পদের ব্যবহার।
- একটি উন্নত জীবনযাত্রার মানের মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদন ভোগে সেইসব মানুষ অংশগ্রহণ করে যারা উন্নত সম্পদের অধিকারী।

বিষয়টিকে নিচে ১নং চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল :

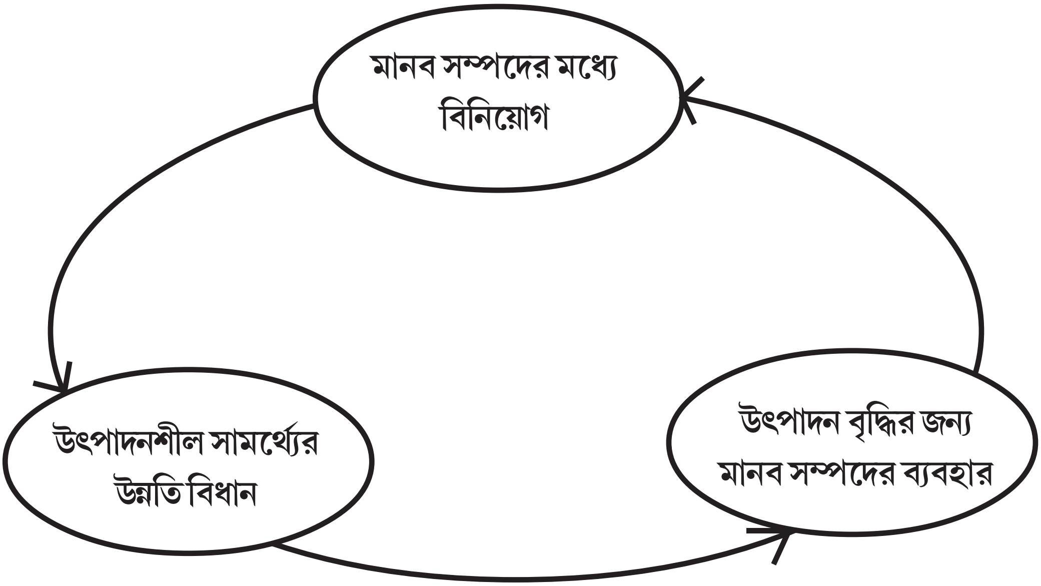
মানব সম্পদের মধ্যে বিনিয়োগ
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মানব সম্পদের ব্যবহার
উৎপাদনশীল সামর্থ্যের উন্নতি বিধান

চিত্র নং - ১

স্থায়ী মানব সম্পদ বিকাশের মধ্যে অবশ্যই এই তিনটি উপাদান থাকবে যা চিত্রের মধ্যে দেখানো হয়েছে। জাতীয় স্তরে, মানব সম্পদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অবশ্যই তার ফলপ্রসূ ব্যবহারে রূপান্তরিত হবে যদি স্থায়ী ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

ব্যক্তিগত স্তরে, মানব সম্পদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ উপার্জন ক্ষমতার উন্নতি ঘটায়। সুতরাং, ব্যক্তি ও তার পরিবারের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয় করার জন্য, এমনকি নিজেদের দক্ষতার বিকাশের জন্য। মানব সম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়নের মধ্যে এখানে গভীর যোগসূত্র রয়েছে। পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি হল জীবনযাত্রার মানের উন্নতির চাবিকাঠি এবং মানব সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই উন্নয়নকে বিবেচনা করতে হবে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে। কখনই মানব জীবনের বিকাশ হতে পারে না, যদি না তাদের পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে, শারীরিক ভাবে সুস্থ না হয় বা লিখতে বা পড়তে না জানে। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাতে সমাজের সমস্ত মানুষ মানব সম্পদ বিকাশের কর্মসূচীর উপযোগিতা লাভ করতে পারে, বিশেষ করে দরিদ্র, মহিলা ও গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষজন।

মানব সম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও নির্বাচন বা পছন্দ হল মূল উপাদান। উৎপাদনশীল কার্যকলাপে অংশগ্রহণের ফলে লব্ধ অর্থনৈতিক পুরষ্কার হল ব্যক্তির জীবনযাত্রার মনের উন্নতির জন্য যে সুযোগসুবিধা বিকাশের ফলে সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি লাভ করার। কাজের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত যোগ্যতার অনুভূতি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে তৈরী হয় এবং এগুলি জীবনযাত্রা মানের উন্নতির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকে। বিকাশের ফলে সৃষ্টি সামর্থ্যের উন্নতি বা বৃদ্ধি ব্যক্তিগত ও জাতীয় উভয়ক্ষেত্রের পছন্দ বা নির্বাচনের সুযোগ লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

ঐতিহাসিকভাবে, মানব সম্পদ বিকাশ বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক উৎপাদশীলতা বুদ্ধির জন্য মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং সেই সঙ্গে একটি জাতির বৃদ্ধি যা অর্থনৈতিক উৎপাদনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিশেষ করে, উন্নয়নশীল দেশগুলির দিক থেকে, সাম্প্রতিককালের সংজ্ঞা ও আলোচনায় মানব সম্পদ বিকাশের মানব সম্পর্কিত দিকের ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। সুতরাং, এই উন্নয়নের দিক থেকে 'মানব সম্পদ বিকাশ' ও 'মানুষের বিকাশ' এই দুটি শব্দের অর্থ অনেক বেশি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

মানব সম্পদ বিকাশের অর্থ (Meaning of HRD) :

American Society of Training and Development এর মতে, মানব সম্পদ বিকাশ হল প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, সাংগঠনিক উন্নয়ন এবং কেরিয়ার (Career) বিকাশের সংহতিপূর্ণ ব্যবহার যা ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংগঠনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে থাকে। সমাজ প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ ও দৈনন্দিন পরিবর্তনের সন্মুখীন হয় যা কর্মচারীদের যথাযথ শিখন অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা সৃষ্টির চাহিদা বৃদ্ধি করে। সেইসঙ্গে মানব সম্পদ বিকাশ সংগঠনের লক্ষ্য মাত্রা ও তার কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে সংগঠনকে সাহায্য করে। এই শিখণ প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও বিকাশের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

Developing Human Resources এর লেখক Leonard Nadler এর মতে :-

প্রশিক্ষণ হল একটি শিখনমূলক কার্যকলাপ যা :-

- সংগঠনের কর্মকর্তারা তাদের কর্মচারীদের জন্য ব্যবস্থা করে থাকে, যাতে তারা আরো ফলপ্রসূভাবে তাদের বর্তমান কাজগুলি করতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য।
- শিক্ষা শিখন পরিকল্পনার ওপর আলোকপাত করে যা একজন ব্যক্তিকে তার বর্তমান কাজ অপেক্ষা পৃথক কাজের জন্য প্রস্তুত করে।
- একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের ওপর উন্নয়ন ও আলোকপাত করে, তবে তা যে সবসময় বৃত্তি সংক্রান্ত হবে এমন কোনও কথা নেই।

২.৪.২. শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিকাশের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between education and human resource development) :

মানব সম্পদ বিকাশের মূলমন্ত্র হল শিক্ষা, যা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বা ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী ও সমাজের উন্নয়ন। এক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা হল:-

- মানব সম্পদের বিকাশের জন্য ব্যক্তির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এর জন্য প্রয়োজন দক্ষতার যথাযথ অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ। বিদ্যালয়ে কর্মশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কর্মের প্রতি আগ্রহী করে তোলা যায়। সেই সঙ্গে পৃথকভাবে 'বৃত্তি শিক্ষার' বিভাগ সৃষ্টি করলে মানব সম্পদ উন্নয়নকে কার্যকরী রূপ দান সহজ হবে।
- স্বাস্থ্যই সম্পদ। দেশের নাগরিকরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে তারা সম্পদ হিসাবে গণ্য হতে পারে না। বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুস্থ থাকার উপায়গুলি সম্পর্কে অবগত করতে হবে। এইভাবে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।

- মানব সম্পদের দ্বারা সমাজ তথা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির সুস্থ ক্ষমতাগুলির যথাযথ বিকাশ। তবেই মানুষ সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ক্ষমতাগুলি প্রকাশে শিক্ষণ সহযোগীর ভূমিকা পালন করবে।
- মানব শক্তিকে সঠিকভাবে ও সঠিকক্ষেত্রে কাজে লাগানোর জন্য মানব শক্তির পরিকল্পনা (Man Power Planning) করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন ধরণের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে নিজেদের কর্মদক্ষতাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে সে ব্যাপারে বিদ্যালয়কে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। তাই সমাজের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষাকে বিন্যস্ত করা দরকার। সমাজের সার্বিক উন্নয়নের কাজে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে মানুষকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। সেইসঙ্গে পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী মানের ও কী পরিমানের মানব সম্পদ প্রয়োজন সেই অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন না হলে মানব সম্পদের অপচয় ঘটতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, মানুষ যেহেতু একটি মূল্যবান সম্পদ, তাই সুপরিকল্পিত ভাবে সমাজ ও জাতির উন্নয়নের স্বার্থে তাকে ব্যবহার করতে হবে। শক্তিশালী জাতি হিসাবে ভারতকে গড়ে তুলতে হলে ভারতীয় নাগরিক মূল্যবান সম্পদে পরিণত করতে হবে এবং সেজন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যা উন্নত মানের জীবনযাত্রা অর্জনে সাহায্য করবে। শিক্ষার শক্তিশালী ভিত্তির মাধ্যমে নাগরিকদের সার্বিক বিকাশ সম্ভব। এই অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছানোর জন্য ১৯৮৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর, মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রক গড়ে উঠেছে। এই মন্ত্রক একদিকে যেমন সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যেমন — সার্বজনীন ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, মিডডে মিল প্রভৃতি। তেমনি অপরদিকে উন্নত মানের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্যও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেমন — MOU তে স্বাক্ষর করেছে যাতে ভারতীয় শিক্ষর্থীরা বিশ্বের উন্নত মানের শিক্ষার সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে।

তবে সবশেষে বলা যায় যে, এব্যাপারে আরো অনেক প্রচেষ্টা ও সদিচ্ছার প্রয়োজন সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে, তবেই আমরা মানব সম্পদের বিকাশে সার্থকতা লাভ করতে সক্ষম হতে পারব।

২.৫ সারসংক্ষেপ : (Summary)

শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল জাতীয় কল্যাণে সহায়তায় করা। জাতীয় কল্যানের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিকাশ ও কল্যাণ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে শিক্ষাই জাতির উন্নয়ন সাধনে সাহায্য করে এবং জনগনের জন্য সমৃদ্ধি। কল্যান ও নিরাপত্তা নিয়ে আসে। গণতান্ত্রিক দেশে একজন ব্যক্তি সুনাগরিক ও যুক্তিবাদী হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষালাভ বিশেষভাবে প্রায়োজন।

মানব সম্পদ বিকাশ হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা মানব সম্পদের মধ্যে বিনিয়োগ, উৎপাদনশীল সামর্থ্যের উন্নতি বিধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মানব সম্পদের মধ্যে বিনিয়োগ, উৎপাদনশীল সামর্থ্যের উন্নতি বিধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মানব সম্পদের ব্যবহারের উপাদানের সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল। মানব সম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে বিনিযোগ এবং জীবন যাত্রার মানের উন্নয়নের মধ্যে গভীর যোগসূত্র রয়েছে। পুষ্টি,

স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি হল জীবনযাত্রার মানের উন্নতি। ঐতিহাসিকভাবে, মানব সম্পদ বিকাশ হল অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং জাতির সম্পদের বৃদ্ধির জন্য মানব সম্পদের উন্নয়ন।

মানবসম্পদ বিকাশের মূলমন্ত্র হল শিক্ষা, যা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বা ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনে তাৎপর্যমূলক ও প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করে। মানব সম্পদের বিকাশের জন্য ব্যক্তির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা নাগরিককে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করা, সমাজ তথা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা, মানব শক্তিকে সঠিকভাবে ও সঠিকক্ষেত্রে কাজে লাগানোর জন্য পরিকল্পনা করা ইত্যাদি শিক্ষা ও সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পরিচালনা করা সম্ভব। শক্তিশালী জাতি হিসেবে দেশকে গড়ে তুলতে হলে দেশের নাগরিককে মূল্যবান সম্পদে পরিণত করতে হবে এবং উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার শক্তিশালী ভিত্তির মাধ্যমে নাগরিকদের সার্বিক বিকাশ ঘটবে।

২.৬ প্রশ্নাবলী : (Questionnaire)

১) শিক্ষাকে জাতীয় কল্যানের হাতিয়ার বলা হয় কেন?

২) শিক্ষাও মানব সম্পদ উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক কি?

৩) মানব সম্পদ বিকাশ সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

৪) শিক্ষা ও মানব-সম্পদ বিকাশের মধ্যে সম্পর্ক কি?

২.৭ তথ্যসূত্র : (Bibliography)

১) সমাজতত্ত্ব (পরিমল ভূষণ কর)

২) সমাজতত্ত্ব (অনাদি ভূষণ মহাপাত্র)

৩) Sociology (C. N. Shankarao)

একক : তিন

শিক্ষা ও আর্থিক বিকাশ

EDUCATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT

গঠন (Structure)

৩.১ সূচনা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ শিক্ষামূলক অর্থনীতি

৩.৪ শিক্ষামূলক অর্থনীতির উদ্দেশ্যে

৩.৫ শিক্ষামূলক অর্থনীতির বিষয়বস্তু

৩.৬ আধুনিক শিক্ষায় অর্থনীতির প্রভাব

৩.৭ স্থীতিশীল উন্নয়নের জন্য শিক্ষা

- ৩.৭.১ স্থিতিশীল বা স্থায়ী উন্নয়নের সংজ্ঞা
- ৩.৭.২ স্থিতিশীল উন্নয়নের উপাদান
- ৩.৭.৩ স্থিতিশীল উন্নয়নের উপায়
- ৩.৭.৪ ব্রান্টল্যান্ড কমিশন
- ৩.৭.৫ ব্রান্টল্যান্ড কমিশনের কাজ ও সুপারিশ
- ৩.৭.৬ স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

৩.৮ সংক্ষিপ্তসার (Summing up)

৩.৯ প্রশ্নাবলী (Questions)

৩.১০ উৎসূট্রবব্র— ত্বরনূ

৩.১. সূচনা (Introduction) :

সাধারণত অর্থনীতি বলতে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বোঝায়। কিন্তু আধুনিক কালে অর্থনীতিকে পৃথক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসাবে আলোচনা করা হয়ে থাকে। আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেছেন অর্থনীতি হল মানবসম্পর্কীয় বিজ্ঞান। অর্থনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা। আবার শিক্ষা মানুষের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করে উন্নত মানবসম্পদ সৃষ্টি করে। যার ফলে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব। এদিক থেকে বিচার করলে শিক্ষা ও অর্থনীতির সম্পর্ক খুবই নিকট।

অর্থনীতির অপর উদ্দেশ্য, সামাজিক সম্পদের সুষণ বন্টন এবং তার সাহায্যে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখা। শিক্ষা এই সুষম সম্পদ বন্টনের সহযোগী পরিবেশ রচনা করে দেয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে অর্থনীতি সর্বদা শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত। পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দুটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান একে অপরকে প্রভাবিত করে। শিক্ষার প্রসার ও গুনগত মান মানোন্নয়ের বিষয়টি নির্ভর করে সমাজের আর্থিক পরিস্থিতিরি উপর। শিক্ষায় বিনিয়োগ, শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনা, শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি সবকিছুই অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উৎপাদনশীলতাকে বৃদ্ধি করে অর্থনীতির ভিত্তিকে সুদৃর করে। এছাড়াও শিক্ষার ফল হিসাবে যখন দেশে স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধিপায় সাথে সাথে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ও পরিলক্ষিত হয়। অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হল মানবকল্যাণ। Lionel Rabinson বলেন, চাহিদা ও অপ্রতুল বহুমুখী ব্যবহারযোগ্য বস্তুসম্পদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মানুষ যেসব আচরণ করে তার বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন হল অর্থনীতি। অর্থনীতি মানবধর্মী হয়ে উঠেছে, কারণ মানুষের আচরণের মূলে যে সকল চাহিদা আছে অর্থনীতিতে তা অনুশীলন করা হয়ে থাকে।

আধুনিকযুগে মানুষকে অনেক বেশি জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য জটিল দক্ষতার প্রয়োজন হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে প্রথাগত শিক্ষার। ফলে জাতীয় অর্থনীতি শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিবেচনা করলে অর্থনীতি ও শিক্ষাবিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কারণ অর্থনীতিতে মানুষের চাহিদার প্রকৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। তাই তাকে শিক্ষার প্রকৃতি জানতে হবে। তা না হলে মানুষের চাহিদার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জানা যাবে না। আবার বলা যায়, ব্যক্তিজীবনের লক্ষ্যের দিক থেকে শিক্ষা ও অর্থনীতি সম্পর্কযুক্ত। কারণ উভয়েরই লক্ষ্য হল ব্যক্তিজীবনের বিকাশে সহায়তা করা।

শিক্ষা ও অর্থনীতির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক স্তরে এটি মানব সম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত। অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ভর করে উৎপাদনশীলতার উপর। বিভিন্ন উৎপাদন কার্যে ব্যবহারের যোগ্য, উন্নত দক্ষতা সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টির ভার শিক্ষার ও পর। শিক্ষার্থীরা কি ধরণের শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে তা কতটা কার্যকরী হতে পারে বা না পারে সে বিষয়টির ওপর নির্ভর করে শিক্ষিত বেকারত্ব বা অশিক্ষিত বেকারত্ব বেড়ে যাবার বিষয়টি। ব্যক্তিগত স্তরে শিক্ষার সাহায্যে পেশাগত অবস্থান নির্ধারিত হয় এবং সামাজিক সচলতা (Social mobility)-র সৃষ্টি হয়। শিক্ষার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তির উপর নির্ভর করে ব্যক্তির পেশাগত দক্ষতা। আবার এই পেশাগত দক্ষতা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান-এর নির্ধারক। শিক্ষা ও অর্থনীতির সম্পর্ক আলোচনার জন্য জ্ঞানের যে বিশেষ শাখা গড়ে উঠেছে তাকে বলা হয় শিক্ষামূলক অর্থনীতি।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives) :

এই অধ্যায়টি পড়ার পর শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে জানতে অভিহিত হবেন –

ক) অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

খ) শিক্ষামূলক অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন।

গ) শিক্ষামূলক অর্থনীতির উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে জানবেন।

ঘ) আধুনিক শিক্ষায় অর্থনীতির প্রভাব কতটুকু সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানবেন।

ঙ) স্থিতিশীল বা সহনশীল উন্নয়নের জন্য শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলি জানবেন।

চ) স্থিতিশীল উন্নয়নের উপায়গুলি সম্পর্কে অভিহিত হবেন।

৩.৩ শিক্ষামূলক অর্থনীতি ঃ (Educational Economics)

‘শিক্ষামূলক অর্থনীতি’ কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন অর্থনীতিবিদ সুল্‌ম। অর্থনীতির উদ্দেশ্যের ন্যায় শিক্ষামূলক অর্থনীতির উদ্দেশ্য হল মানবকল্যান। শিক্ষামূলক অর্থনীতিকে তাই বলা হয়, Economics of education is that branch of economics which is concerned with the welfare programmcs of education.

৩.৪ শিক্ষামূলক অর্থনীতির উদ্দেশ্য ঃ (Objectives of Educational Economics)

ক) শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা।

খ) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমান স্থির করা।

গ) সামাজিক আয়ের কিছু অংশ শিক্ষাখাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া।

ঘ) শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী ও সামাজিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা।

ঙ) শিক্ষা পরিকল্পানার কাজে সহায়তা করা।

চ) শিক্ষা ব্যবস্থা বিকাশের নির্ধারকগুলি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যা পরিকল্পনা রচনায় সহায়ক হবে।

৩.৫ শিক্ষামূলক অর্থনীতির বিষয়বস্তু ঃ (Content of Educational Economics)

শিক্ষামূলক অর্থনীতির বিষয়বস্তুগুলি হল–

ক) অর্থনৈতিক বিকাশ শিক্ষামূলক বিকাশের পারস্পরিক সম্পর্ক।

খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা।

গ) শিক্ষাকে সামাজিক বিনিয়োগ ও সেবামূলক কাজ হিসাবে আলোচনা করা।

ঘ) শিক্ষার মাধ্যমে কাজের সুযোগ কীভাবে বাড়ানো যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা।

ঙ) মানবশক্তি পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করা।

চ) শিক্ষামূলক অর্থনীতিতে সেইসব গাণিতিক তত্ত্ব ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, সেগুলি শিক্ষাব্যবস্থার সুষ্ঠ পরিকল্পনায় বিশেষভাবে সহায়তা করে।

ছ) শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা ও শিক্ষার জন্য আর্থিক সংস্থান কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা।

৩.৬ আধুনিক শিক্ষায় অর্থনীতির প্রভাব ঃ (Influence of Economics in modern Education)

আধুনিক শিক্ষায় তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক উভয় দিকের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে।

ক) অর্থনীতির প্রভাবে আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে মনে করা হয় শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ নয়। শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানব সম্পদ উন্নয়ন। মানবব সম্পদ বলতে সমগ্র মানুষ্য জাতিকে বোঝায়। আর এই ‘সম্পদ’ শব্দটি ব্যবহারের পশ্চাতে অর্থনীতির ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

খ) অর্থনীতির প্রভাবে পাঠক্রম সম্পর্কিত ধারণারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক অর্থে, শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবন পরিবেশ ও জীবন অভিজ্ঞতা পাঠক্রমের অন্তভূর্ক্ত। সীমিত সম্যক অভিজ্ঞতা বা গতানুগতিকতা বর্জন করে পাঠক্রম সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে মানবশক্তির চাহিদাকে। পাঠক্রম সম্পর্কে ধারণার এই প্রসারতা ও বিস্তৃতির পশ্চাতে রয়েছে অর্থনীতির প্রভাব।

গ) শিক্ষার উপর অর্থনীতির প্রভাবে শিক্ষা সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষক যে কেবল সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন তা নয়। আধুনিক শিক্ষা তাৎপর্যগত দিক থেকে শির্ক্ষাথীকেন্দ্রিক হলেও শিক্ষকের ভূমিকাও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। মানব শক্তির বিকাশে শিক্ষক যে কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করেন এবং পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবায়িত করার কাজে সক্রিয়ভূমিকা পালন করেন তার পিছনে রয়েছে শিক্ষার অর্থনৈতিক তাৎপর্য। শিক্ষক তার কর্মপদ্ধতির একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনা রচনা করবেন যাতে শিক্ষার্থীর সহজাত ক্ষমতাগুলিকে সর্বতোভাবে কাজে ব্যবহার করা যায়।

ঘ) শিক্ষকের কর্ম-সক্রিয়তার সঙ্গে শিক্ষন পদ্ধতিতেও অর্থনীতির প্রভাব বিদ্যমান। প্রকল্প ভিত্তিক পদ্ধতি, উৎপাদন ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি পদ্ধতি-কৌশল অর্থনীতির নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য শিক্ষন পদ্ধতির উপর নানান পরীক্ষানিরীক্ষা করার ভাবনাটিও অর্থনীতির নির্দেশনা প্রস্তুত। শিক্ষামূলক অর্থনীতি পদ্ধতি ও কৌশলগুলির মধ্যে পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেছে।

ঙ) বর্তমানে শিক্ষাকে সমাজের এক অর্থনৈতিক বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শিক্ষা প্রশাসনের আদর্শগত প্রসঙ্গটি ঘনিষ্টভাবে জড়িত থাকে। শিক্ষা পরিচালনায় আয় ব্যায় বিশ্লেষণের যে নীতিটি অনুসৃত

হয়, তার মূলে রয়েছে অর্থনীতির প্রত্যক্ষ নির্দেশনা। অর্থাৎ শিক্ষাব্যবস্থায় আর্থিক দ্বায়িত্ব বন্টনের নীতি নির্ধারণে এবং প্রশাসনিক কাঠামো নির্ধারণে অর্থনীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষায় অর্থনৈতিক ভিত্তির বিষয়টিকে শুধুমাত্র বস্তুগত দিক থেকে বিবেচনা করলে চলে না, ভাবগত বা আদর্শগত দিক থেকেও অর্থনৈতিক ভিত্তি সমানভাবে মূল্যবান। অর্থাৎ শিক্ষার অর্থনৈতিক ভিত্তি বলতে কেবল মাত্র জীবিকা সম্পর্ক বিজড়িত সংকীর্ণতাকে বোঝায় না। শিক্ষার অর্থনৈতিক ভিত্তি শিক্ষাকে জীবনকেন্দ্রিক করে গড়ে তোলার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, অর্থনীতি শিক্ষার আধুনিক ভাবধারাকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষার অর্থনৈতিক ভিত্তি শিক্ষাতত্ত্বকে আরো বিস্তৃত পর্যবেক্ষন এবং বিশ্লেষণ করতে আমাদের সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও প্রত্যার্পন বিষয়টি গুরুত্ব পেয়ে আসছে। শিক্ষা প্রক্রিয়াকে পূর্বে Non Productive Activity হিসাবে গন্য করা হলেও আজ রাষ্ট্রগুলির কাছে তা Productive Activity যা মানবকল্যাণ, অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়ণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

৩.৭ স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ঃ (Education as a tool of Sustainable Development)

বর্তমান শতাব্দিতে সবচেয়ে ব্যাপকতর প্রচলিত শব্দ হল স্থিতিশীল উন্নয়ন (বা যে উন্নয়নকে ধরে রাখা হয়), তবে আজ পর্যন্ত কোনো পরিবেশ বিজ্ঞানী স্থিতিশীল উন্নয়নের নির্দিষ্ট কোন মডেল বা নীতি নির্দেশিকা দিতে পারেননি। এমনকি স্থিতিশীল উন্নয়ণের ধারণাটিও ব্যাপক সমালোচনা সম্মুখীন হয়েছে। এর প্রধান কারণ হল পৃথিবীর শিল্পোন্নত উন্নয়নের দেশগুলি পরিবেশ সমস্যা ও পরিবেশ ভাবনার সঙ্গে অল্পোন্নত দরিদ্র দেশগুলির সমস্যা ও ভাবনার বিপুল পার্থক্য। উন্নত দেশের মূল চেষ্টা সাসটেনএবিলিটি (sustainability) অর্থাৎ বর্তমানের পরিবেশগত বাধাগুলিকে দূর করে জীবনযাত্রার মানকে কীভাবে বজায় রাখা যাবে। শিল্প সংক্রান্ত দূষণ দূরীকরণ বিপদজনক বর্জ্যপদার্থের নিকাশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরকে বজায় রাখা তাঁদের প্রধান দুশ্চিন্তা। গ্রিনহাউস গ্যাসের দ্বারা পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের (CFC) ফলে ওজোন স্তরে ছিদ্র – এগুলি তাঁদের বাঁচা ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের জোগান কোথা থেকে কীভাবে আসবে, তা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না।

অন্যদিকে অনুন্নত বা অল্পোন্নত দেশগুলিতে পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা অর্থনীতি ও পরিবেশের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের দিকগুলি তুলে ধরেছেন। তাঁরা বলেছেন দরিদ্র মানুষের কাছে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সমস্যার কথা তুলে লাভ নেই। আশু অর্থনৈতিক সমস্যা ও দারিদ্র দূরীকরণের সঙ্গে আঞ্চলিক পরিবেশ অবনমনের মোকাবিলা করা তাঁদের কাছে বেশি প্রয়োজনীয়।

স্থিতিশীল পৃথিবী ঃ (Sustaninable World) ঃ

পরিবেশকে জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্য হল স্থিতিশীল এক বিশ্ব গড়ে তোলা (to create a sustainable world), যেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এখানকার উন্নত জীবনযাত্রার ও স্বাস্থ্যের মান নিয়ে মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় থাকবে। ধারণযোগ্য মানে ‘অপরিবর্তনশীল’ নয়; এর অর্থ হল মানুষের জীবন ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু, পৃথিবী থেকে তা যথেষ্ট পরিমানে পাওয়া যাবে। যেমন ধারণযোগ্য পৃথিবীতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের অন্নসংস্থানের জন্য যথেষ্ট খাদ্যশষ্য উৎপন্ন হবে, একই সঙ্গে মাটির উর্বরতা অক্ষুন্ন থাকবে যাতে পরের বছর আবার যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য উৎপন্ন করা যায়। প্রতিটি মানুষকে যথেষ্ট পরিমানে পরিচ্ছন্ন জল সরাবরহ করা হবে, আবার সেই সঙ্গে এ-ও দেখতে হবে যাতে পরের বছরে একই পরিমানে পানীয় জল পাওয়া যায়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় নষ্ট না করেও দেশ ও দশের মঙ্গল করা যায় তাকে স্থিতিশীল উন্নয়ন বলে।

৩.৭.১ স্থিতিশীল বা স্থায়ী উন্নয়নের সংজ্ঞা ঃ (Defination of sustainable Development)

অর্থনীতি , সমাজবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার দৃষ্টিকোন থেকে নানা ভাবে স্থিতিশীল উন্নয়নের সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যেমন –

ক) বিশ্বপরিবেশ উন্নয়ন কমিশন বা ব্রান্টল্যান্ড কমিশন (Bruntland Commission)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর প্রচেষ্টায় কোনো বাধা সৃষ্টি না করে, বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর জন্য গৃহীত পরিকল্পনাকে স্থিতিশীল উন্নয়ণ কল্পে। অর্থাৎ যে উন্নয়ণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদের ভাণ্ডারকে অটুট রেখে বর্তমান প্রয়োজনের চাহিদা মেটায় তাই হল স্থিতিশীল বা স্থায়ী উন্নয়ণ (Development that needs the present without compromising the ability of future generations to much their own needs)।

খ) রবার্ট রিপিটো তাঁর Global Possible পুস্তকে স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে সেই জাতীয় উন্নয়ন পদ্ধতির কথা বলেছেন, যা বৈদেশিক ঋণের বোঝা থেকে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মুক্ত করে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দক্ষতা ও মানবিক গুনাবলি বৃদ্ধি করে এবং পরিবেশের অবনতি ও সম্পদ হ্রাস রোধ করে।

গ) ড. ইউদো আর্নেস সিমোনিস (Dr. Udo Ernst Simonis)-এর মতে, স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে সেই উন্নয়ন প্রকল্পকে বোঝায় যার মাধ্যমে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রাকৃতিক সম্পদের গুনমান ও কার্যকারীতা বজায় রেখেও সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করা যায়।

৩.৭.২ স্থিতিশীল উন্নয়নের উপাদান ঃ (Factors of Sustainable Development)

স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি একটি চিত্রাকারে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ঃ

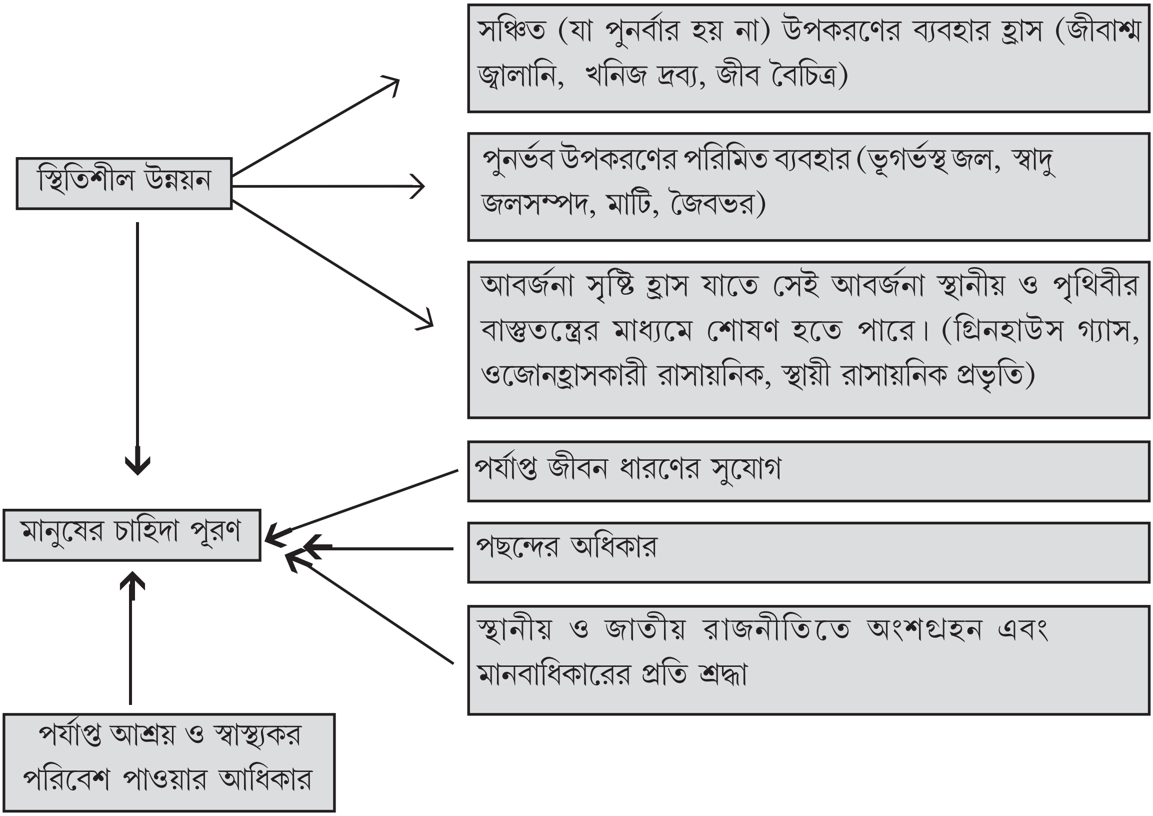

স্থিতিশীল উন্নয়ন

সঞ্চিত (যা পুনর্বার হয় না) উপকরণের ব্যবহার হ্রাস (জীবাশ্ম জ্বালানি, খনিজ দ্রব্য, জীব বৈচিত্র)

পুনর্ভব উপকরণের পরিমিত ব্যবহার (ভূগর্ভস্থ জল, স্বাদু জলসম্পদ, মাটি, জৈবভর)

আবর্জনা সৃষ্টি হ্রাস যাতে সেই আবর্জনা স্থানীয় ও পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের মাধ্যমে শোষণ হতে পারে। (গ্রিনহাউস গ্যাস, ওজোনহ্রাসকারী রাসায়নিক, স্থায়ী রাসায়নিক প্রভৃতি)

মানুষের চাহিদা পূরণ

পর্যাপ্ত জীবন ধারণের সুযোগ

পছন্দের অধিকার

স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহন এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা

পর্যাপ্ত আশ্রয় ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পাওয়ার আধিকার

৩.৭.৩ স্থিতিশীল উন্নয়নের উপায় ঃ (Ways of Sustainable Development)

পৃথিবীর অল্পোন্নত দেশগুলি চেষ্টা করছে বর্তমানের পরিবেশের বাধাগুলি দূর করে তাদের অধিবাসীদের সেই দেশগুলির সমপর্যায়ে নিয়ে যেতে যাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত। এর থেকেই ‘স্থিতিশীল উন্নয়ন’ কথাটি এসেছে। শুধু তাই নয় স্থিতিশীল উন্নয়ন কিভাবে হয় তা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। একদল পরিবেশবিদের মতে বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে পাশ্চাত্য মডেল আমাদের সামনে আছে তাকে স্থিতিশীল উন্নয়ন বলা চলে না; এ পথে উন্নয়ন করতে গেলে পরিবেশের অবনমন ঘটবেই এবং এমন একটা সময়আসবে যখন উন্নয়ন ব্যহত হবে। অন্যদের বক্তব্য হল একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই বর্তমানে এসব দেশের প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহারের ধরণ বদলানো সম্ভব। কেউ কেউ এ-ও মনে করেন যে দারিদ্র্যই পরিবেশের অবনমনের জন্য দায়ী। আবার অন্যদের মতে পৃথিবীর ধনী দেশগুলির কাজকর্মের জন্যই গরীব দেশগুলির পরিবেশের অবনমন ঘটছে।

বর্তমানে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তাকে কোনোমতেই স্থিতিশীল বলা চলে না। জীবনযাত্রার মান উঁচু করত গিয়ে বা ধনী দেশগুলির উঁচু জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে গিয়ে আমরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপকরণগুলিকে নির্বিচারে ক্ষয় করে চলেছি। পৃথিবীর মাটি, জল, বাতাস, কাঠ ও খনিজদ্রব্যের পরিমান দ্রুতহারে ক্ষয় পেয়ে চলেছে। এগুলির পরিবর্ত দ্রব্য উদ্ধাবন করতে না পারলে এবং এগুলিকে ঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে না পারলে ভবিষ্যতে আমাদের জীবন রক্ষা করা কঠিন হবে। সুতরাং আমাদেরও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে এখন থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার যাতে পরিবেশের অবন্মন ঘটে মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে না পড়ে।

‘স্থিতিশীল উন্নয়ন’ শুধু একটা বিমূর্ত ধারণা বা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নয়। 1960 খ্রিস্টাব্দ থেকে ধীরে ধীরে পরিবেশের সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে বিশ্বজুড়ে যে তীব্র বিতর্ক গড়ে ওঠে এটি তারই ফল। এর মধ্যে দুটি আঙ্গিক রয়েছে ঃ উন্নয়নের প্রকৃত অর্থ (অর্থাৎ উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য, যেমন অর্থনৈতিক বিকাশ, মৌলিক চাহিদা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অধিকার ইত্যাদি); এবং উন্নয়নকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ।

ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন স্ট্রাটেজি (World conservation Strategy, 1980) সংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এবং সংরক্ষণ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়। এই কর্মপদ্ধতির তিনটি উদ্দেশ্য ছিল ঃ (১) মানুষের অস্তিত্বরক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বাস্তুসংস্থানিক প্রক্রিয়াগুলিকে সচল রাখা; (২) জীবজগতের জিনগত বৈচিত্র রক্ষা করা এবং (৩) প্রজাতি ও বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীল ব্যবহার সুনিশ্চিত করা। লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজি সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকগুলিকে উল্লেখ না করে একমাত্র বাস্তুসাংস্থানিক স্থিতিশীলতার (Ecological Sustainability) উপরে জোর দেয়। স্থিতিশীল নয় এমন উপকরণের ব্যবহার মানুষ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে করে বা করতে বাধ্য হয় তার দিকেও এটি দৃষ্টি কোন দেয়নি।

৩.৭.৪ ব্রান্টল্যান্ড কমিশন ঃ (Brundtland Commissoon, 1987)

1983 খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপুঞ্জ ‘ওয়াল্ড কমিশন অন এনভায়রমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (World Commission on Environment and Development) নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। গ্রো হারলেম ব্রান্টল্যান্ড (Gro Harlem Brundtland) ছিলেন সভাপতি। 1987 খ্রিস্টাব্দে এই কমিশন (যা ব্রান্টল্যান্ড কমিশন নামে সুপরিচিত) প্রথম তার রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টের নাম ছিল ‘আমাদের সাধারণ ভবিষ্যৎ’ (Our Common Future)। এই রিপোর্টে কমিশন সদস্যরা পৃথিবীর সমস্ত দেশকে আহ্বান করেন ‘স্থিতিশীল উন্নয়নকে’ তাঁদের লক্ষ্য করে তুলতে এবং এর জন্য নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলি গ্রহন করতে ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নকে পুনজাগ্রত করা ঃ পরিবেশের অবনমনের মূল কারণ হল দারিদ্র্য। বিশেষ করে উন্নতিশীল দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, সেই সঙ্গে উপকরণের ভিত্তিকেও বাড়াতে হবে। পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলি এই অর্থনৈতিক জাগরণে বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুণমান বদল করা ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য স্থিতিশীল উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়, নিরাপত্তা ও সাম্য প্রভৃতি। আয়ের সুষম বন্টন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রাযুক্তিক ঝুঁকিতে কম ক্ষতি, উন্নত স্বাস্থ্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষা – এগুলির মাধ্যমে গুণমান বৃদ্ধি পাবে।

উপকরণ ভিত্তির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করা ঃ উন্নয়নকে স্থিতিশীল হতে গেলে পরিবেশগত উপকরণগুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে। যেমন পরিচ্ছন্ন বায়ু, জল, বন এবং মাটি, জীবজগতের বৈচিত্র ইত্যাদি। এ ছাড়া, এনার্জি, জল ও কাঁচামালের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াতে হবে। উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে মাথাপিছু প্রাকৃতিক উপকরণ ভোগের পরিমান কমাতে হবে এবং দূষণ ঘটায় না এমন পণ্য ও প্রযুক্তির দিকে ক্রমশ গুরুত্ব দিতে হবে।

স্থিতিশীল জনসংখ্যা বজায় রাখা ঃ দেশের জনসংখ্যানীতি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে জনসংখ্যা স্থিতিশীল স্তরে থাকে। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং গরীবদের জীবনযাপনের সুযোগ বাড়ানোর জন্য নয়া অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে জনসংখ্যা নীতিকে মেলাতে হবে।

প্রযুক্তির মোড় ফেরানো এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ঃ বিশেষ করে উন্নতিশীল দেশে প্রাযুক্তিক উন্নয়নের দিক পরিবেশ-অভিমুখী করে তুলতে হবে। এর ফলে প্রযুক্তি ব্যবহারের ঝুঁকি কমে যাবে। এছাড়া পরিবেশগত এবং উন্নয়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে জনসাধরণের অংশগ্রহন এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যের সরাবরহ বাড়ানো দরকার।

সিদ্ধান্ত গ্রহনে পরিবেশ ও অর্থনীতিকে মেলাতে হবে ঃ দেশের নীতি সম্পর্কিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিগণের শুধুমাত্র আর্থিক লাভ-ক্ষতির হিসাব না করে, পরিবেশগত লাভ-ক্ষতির হিসাবও করা দরকার। তাঁরা পরিবেশগত সমস্যার লক্ষণগুলিকে নয়, মূল উৎসগুলিকে খুঁজে বার করবেন।

আন্তজার্তিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের পুনর্গঠন ঃ উন্নতিশীল অনেক দেশের পক্ষেই আন্তজার্তিক বাজারে অংশ গ্রহন করা কঠিন; এদের হাতে আন্তজার্তিক স্তরে পুঁজি এবং উন্নত প্রযুক্তি অনেক সময়ে পৌঁছায় না। এসব দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভিত্তিকে প্রসারিত করতে হবে এবং স্বনির্ভর তা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে।

আন্তজার্তিক সাহায্য ও সহায়তা বাড়াতে হবে ঃ আন্তজার্তিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে পরিবেশগত সমীক্ষা, মূল্যায়ণ, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উপকরণ পরিচালনার উপরে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এরজন্য প্রতিটি দেশকেই আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হতে হবে। আন্তজার্তিক নিয়মকানুনগুলি ঠিকমতো পালন করতে হবে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরিবেশগত ব্যাপারে গঠনমূলক আলাপ-আলোচনা বাড়াতে হবে।

৩.৭.৫ ব্রান্টল্যান্ড কমিশনের কাজ ও সুপারিশ ঃ (Function and Recommendations of Brundtland commission)

রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে ব্রান্টল্যান্ড কমিশন (Brundtland commission) স্থাপিত হয় যার নাম দেওয়া হয়েছে World Commission on Environment and Development। নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী গ্রো হারলেম (Gro Harlem) এর নেতৃত্ব 1987 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় যার 'আওয়ার কমন ফিউচার' (Our common Future) বইটি। এই কমিশনের কাজ ছিল ঃ

- পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলিকে পুনর্বার পরীক্ষা করে উদ্ভাবনী ও বাস্তব কর্মপ্রকল্পের রূপরেখা দেওয়া;

- পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ে আন্তজার্তিক স্তরে সহায়তা বৃদ্ধি এবং বর্তমান ধারার বাইরে নতুন ধরণের সহযোগিতার পথ বার করা যাতে প্রয়োজনীয় দিকে সরকারি নীতির মোড় ফেরানো যায়; এবং

- ব্যক্তির ক্ষেত্রে, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে, শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে গবেষণা সংস্থার ক্ষেত্রে এবং সরকারী স্তরে পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহদান।

ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রধান সুপারিশগুলিকে টোকিও ডিক্লারেশন (Tokyo Declaration) বলে। এগুলি হল ঃ

- **উন্নয়নের পুনরুজ্জীবন ঃ** পরিবেশ অবনমনের ফলে প্রধান উৎস হল দারিদ্র্য, সুতরাং উন্নতিশীল দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাড়াতে হবে এবং উপকরণভিত্তিকে প্রসার করতে হবে। শিল্পোন্নত দেশগুলি, যাদের এই ক্ষমতা আছে, তাদের সমস্ত পৃথিবীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবদান রাখতে হবে।

- **উন্নয়নের গুনগত মানের পরিবর্তন আনতে হবে ঃ** পুনরুজ্জীবীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারণযোগ্য হবে এবং তার উদ্দেশ্য হবে সামাজিক সাম্য, সামাডজিক সুবিচার এবং নিরাপত্তা বিধান। এজন্য শক্তির ব্যবহার পরিবেশগত দিক থেকে নিরাপদ ও ধারণ যোগ্য হবে। আয়ের সুবন্টন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস এবং প্রযুক্তিগত ঝুঁকি কমানো, জনস্বাস্থের উন্নতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষা – উন্নয়নের গুনগত মান বাড়াতে এগুলির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ।

- **প্রযুক্তির মোড় ফেরানো এবং বিপদের ঝুঁকি কমানো ঃ** উন্নতিশীল দেশগুলিতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের গতি বাড়াতে হবে শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সকল দেশের প্রগতিযুক্ত উদ্ভাবনের উন্নয়নের মোড় ফেরাতে হবে এবং পরিবেশগত বিষয়গুলির প্রতি সুবিচার করতে হবে। আগের চেয়ে বেশি সংখ্যায় সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার সুবিধা বাড়াতে হবে। এভাবে পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনে সাধারণ মানুষের ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে।

- **পরিবেশ ও অর্থনীতিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে মেলাতে হবে ঃ**

সরকারী ও রাজনৈতিক স্তরে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (যেমন নদীতে বন্যা প্রতিরোধের জন্য কী করা হবে), তার পরিবেশগত প্রভাব কি হতে পারে সেটা জানা দরকার। পরিবেশের ক্ষতিকারক বিষয়গুলির মূল উৎস কী তা খুঁজে বার করে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

- **আন্তজার্তিক অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির সংশোধন ঃ** উৎপন্ন দ্রব্য সহজে বাজারে পৌঁছোবার ক্ষমতা গড়ে তোলা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, আন্তজার্তিক ঋণ প্রভৃতি দিক থেকে উন্নতিশীল দেশগুলিকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। এসব দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভিত্তির প্রসার ঘটাতে হবে এবং নির্ভরতা গড়ে তুলতে হবে।

- **আন্তজার্তিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করে তুলতে হবে ঃ**

আন্তজার্তিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবেশের শুদ্ধতা বজায় রাখা, নিয়মিত পরীক্ষা করা, মূল্যায়ণ করা, গবেষণা ও উন্নতি, উপকরণ ব্যবস্থাপনার উপরে অগ্রধিকার দিতে হবে। এর জন্য সকল দেশকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে দ্বায়িত্ব স্বীকার করতে হবে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আন্তজার্তিক নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে এবং বহুপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে স্থিতিশীল মানবিক বিকাশ করতে হবে।

- **স্থিতিশীল উন্নয়ন ঃ** উন্নয়নকে স্থিতিশীল হতে গেলে তাকে অর্থনৈতিক ছাড়াও সকল সামাজিক ও বাস্তুতান্ত্রিক বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, সকল জৈব ও অজৈব উপকরণ-ভিত্তিকে গণ্য করতে হবে, স্বল্পকালীন ছাড়াও দীর্ঘকালীন উপকারিতা ও অপকারিতার কথা খেয়াল রাখতে হবে এবং বিকল্প কর্মপদ্ধতিগুলিকে বিচার করে সঠিক পথটি খুঁজে নিতে হবে।

- **পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ঃ** পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি পরস্পরের সঙ্গে নিবীড় ভাবে জড়িত। এদের সমাধানও তাই পরস্পরনির্ভর। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ক্ষেত্র অনুযায়ী ভাগ করে (sectoral fragmentation) সেগুলির উদ্দেশ্য হিসাবে চিরকাল বিচার করা হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর বহু পরিবেশ ও উন্নয়ন সমস্যার উৎস এই ক্ষেত্রবিভাগের মধ্যে নিহিত আছে। যেমন– কৃষিদপ্তর কৃষি উন্নয়ন বিষয়টি দেখাবে, সেচ দপ্তর সেচ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের পরিমান মাপ করবে। স্থিতিশীল উন্নয়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী ভাগ না করে সামগ্রিকভাবে বিচার করা প্রয়োজন।

- **উপকরণ-ভিত্তির সংস্করণ ও প্রসার ঃ** পরিচ্ছন্ন বাতাস, জল, অরণ্য এবং মৃত্তিকা জৈববৈচিত্র্য বজায় রাখা এবং এনার্জি-জল-কাঁচামালকে দক্ষভাবে ব্যবহার প্রভৃতির মাধ্যমে উন্নয়নকে স্থিতিশীল করে তোলা সম্ভব। উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহারের পরিমান কমাতে হবে এবং ক্রমশ দূষণবিহীন দ্রব্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকে ঝোঁক বাড়াতে হবে।

- **স্থিতিশীল জনসংখ্যা বজায় রাখতে হবে ঃ** জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এমন হতে হবে যে সেগুলি অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন-মূলক প্রকল্পের সঙ্গে সুসম্বন্ধ। শিক্ষা এবং দারিদ্র শ্রেণির জীবনধারণের সুযোগ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিকল্পনা নিতে হবে।

১.৭.৬ স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ (Others improtant recommendations for Sustainable Development)

লন্ডনের সাসটেন এবিলিটি লিমিটেড (Sustainability Ltd.) উপভোক্তাদের উদ্দেশ্যে একটি নীতির তালিকা প্রকাশ করে। এতে বলা হয় ভোক্তারা এমন দ্রব্য ব্যবহার করবেন না যা–

- ❖ নিজের বা অপরের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়;
- ❖ উৎপাদন, ব্যবহার বা পরিত্যাগের সময়ে পরিবেশের বিশেষ ক্ষতি করে;
- ❖ অপ্রয়োজনীয় অপচয় হয়;

- বিলুপ্তির মুখে এমন প্রাণী বা পরিবেশ থেকে কাঁচামাল গ্রহণ করে;
- উৎপাদন, ব্যবহার বা পরিত্যাগের সময়ে বিপুল পরিমানে এনার্জি ব্যবহার করে;
- পরীক্ষামূলক ভাবে হলেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে পশুদের উপরে নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে তৈরি এবং
- অন্যান্য দেশকে, বিশেষ করে উন্নতিশীল দেশগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি উচ্চারিত হয় 1922 খ্রিস্টাব্দের রিও দি জেনেইরোর আর্থ সামিট বা ইউনাইটেড নেশনস্ কনফারেন্স অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এ (UNCED)। এই মূলনীতিগুলিকে রিও ডিক্লারেশন (Rio Declaration) বলে। এই ডিক্লারেশন স্টকহোমের পরিবেশ সম্মেলনের যোঘণাগুলিকে পুনর্বার স্বীকৃতি দেয় এবং তার উপরে নতুন নীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল আন্তজার্তিক স্তরে সমঝোতা ও সমান অংশীদারীর মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষের মধ্যে নতুন স্তরে যৌথ প্রচেষ্ঠা গড়ে তোলা। কতকগুলি আন্তজার্তিক চুক্তি সম্পাদন করা যাতে সকলের স্বার্থ বজায় রেখে বিশ্বের পরিবেশ ও উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে অক্ষুন্ন রাখা যায়। পৃথিবীর সুসংহত, পরস্পরনির্ভর প্রকৃতিকে স্বীকার করে এই সম্মেলন ঘোষণা করে যে ঃ

- স্থিতিশীল উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার মূলে আছে মানুষ। প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে সুস্থ ও উৎপাদনশীল জীবনের অধিকার তাদের আছে।

- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চার্টার অনুযায়ী এবং আন্তজার্তিক আইনের নিয়মানুসারে প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব পরিবেশগত ও উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ করার এবং নিজস্ব উপকরণ উত্তোলন ও ব্যবহারের অধিকার আছে। সেই সঙ্গে তাদের দায়িত্ব হল নিজ রাষ্ট্রের সীমানার ভেতরের কার্যাবলী যাতে সীমানার বাইরের কোনো রাষ্ট্র বা এলাকার পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে তা সুনিশ্চিত করা।

- উন্নয়নের অধিকার এভাবে পূরণ করতে হবে যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সকলের উন্নয়নগত এবং পরিবেশ গত প্রয়োজনগুলি সমানভাবে পূরণ হয়।

- উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গী অংশ হল পরিবেশগত সুরক্ষা।

- প্রতিটি রাষ্ট্র কার্যকরী পরিবেশগত আইনকানুন তৈরি করবে। পরিবেশের নাম, ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে এবং অগ্রধিকারগুলি রাষ্ট্রের পরিবেশগত এবং উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিফলিত হবে। এক দেশের মান অন্য দেশের বেখাপ্পা বা প্রয়োজনীয় হতে পারে, বিশেষ করে উন্নতিশীল দেশগুলিতে এর ফলে সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে, তাই দেশের পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী নিয়মগুলি তৈরি হবে।

- প্রতিটি রাষ্ট্র সাহায্যকারী আন্তাজার্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহযোগিতা করবে। একতরফা চেষ্টার মাধ্যমে নিজের এলাকার বাইরের পরিবেশগত সমস্যার মোকাবিলা না করাই ভালো। পরিবেশগত উদ্দেশ্যে বাণিজ্যনীতি এমন হতে হবে যে আন্তজার্তিক বাণিজ্যের ওপর অযৌক্তিক বাছবিচার বা ছন্দ নিয়ন্ত্রন না থাকে।

- দারিদ্র্য দূরীকরণ হল স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল কথা। সেই উদ্দেশ্যে প্রতিটি রাষ্ট্র ও প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রার মানের তারতাম্যগুলি দূর করা এবং পৃথিবীর মানুষের বৃহত্তর অংশে প্রয়োজনগুলি মেটানোর চেষ্টা করা।

- উন্নতিশীল দেশগুলির বিশেষ অবস্থা এবং প্রয়োজনগুলিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে কম উন্নত এবং পরিবেশগত ভাবে বিপদের সম্মুখীন দেশগুলির কথা ভাবতে হবে। আন্তজার্তিক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে সব দেশগুলির স্বার্থ ও প্রয়োজন মেটানোর কথা খেয়াল রেখে পরিবেশ ও উন্নয়ন করতে হবে।

- পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রকে সংরক্ষণ, সুরক্ষা এবং পুনর্স্থাপন করার জন্য সমস্ত রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। এর জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভূমিকা ও দায়িত্ব আলাদা হবে। উন্নত দেশগুলির প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার ফলে যেসব সমাজ বিশ্বের পরিবেশের উপরে চাপ দিচ্ছে তার দায়িত্ব স্বীকার করে স্থিতিশীল উন্নয়নের পথ খুঁজতে হবে।

- স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং সকল মানুষের উন্নত জীবনযাত্রার মান পেতে গেলে প্রতিটি রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল নয় এমন উৎপাদন এবং ভোগের ধরণ কমাতে বা বাতিল করতে হবে এবং উপযুক্ত জনসংখ্যানীতি অনুসরণ করতে হবে।

- প্রতিটি রাষ্ট্র পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে স্থিতিশীল উন্নয়ন করার জন্য অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা গড়ে তুলবে। তা সম্ভব হবে বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক জ্ঞানের আদানপ্রদান, প্রযুক্তির উন্নয়ন, সামঞ্জস্যসাধন, প্রসার এবং হস্তান্তরের মাধ্যমে।

- বিশেষ স্তরে সকল নাগরিকের সক্রিয় অংশ গ্রহনের মাধ্যমে পরিবেশগত সমস্যাগুলির শ্রেষ্ঠ সুরাহার সম্ভব। জাতীয় স্তরে প্রতিটি ব্যক্তির প্রাসঙ্গিক সরকারি তথ্য পাওয়ার অধিকার থাকবে। এ ছাড়া রাষ্ট্রগুলি সাধারণ মানুষের সচেতনতা এবং অংশগ্রহীতায় উৎসাহ প্রদান করবে। বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি সাধারণ মানুষের সমস্ত সমস্যা সুরাহার ব্যবস্থা থাকবে।

- প্রভাবিত হতে পারে এমন দেশসমূহকে প্রতিটি রাষ্ট্র সময়মতো সতর্কবাণী এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী দেবে যা তাদের নিজের দেশের সীমানার মধ্যের কার্যাকরী বিষয়ে বা সীমানার বাইরে অন্যান্য দেশের পরিবেশের উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে।

- পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে নারীদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। স্থিতিশীল উন্নয়ন করতে গেলে সেজন্য তাদের পূর্ণ অংশ গ্রহণ অপরিহার্য।

- বিশ্বের তরুণ সম্প্রদায়ের সৃষ্টিশীলতা, আদর্শ এবং সাহসকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বজোড়া সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে স্থিতিশীল উন্নয়নের মাধমে সকলের জন্য শ্রেয়তর এক ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে হবে।

- পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের বিষয়ে আদিবাসী ও জনজাতি সম্প্রদায়গুলি এবং অন্যান্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিজস্বতা, সংস্কৃতি ও স্বার্থকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তারা যাতে প্রকৃত অর্থে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশগ্রহন করতে পারে তা দেখা।

- দমিত-পীড়িত মানুষের এবং অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী পরিবেশ ও প্রাকৃতিক উপকরণগুলিকে সুরক্ষা করতে হবে।

- স্থিতিশীল উন্নয়নের পরিপন্থী হল যুদ্ধবিগ্রহ। সেজন্য প্রতিটি রাষ্ট্র যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে পরিবেশের সুরক্ষামূলক আন্তজার্তিক আইনগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং সেগুলিকে আরও বাড়ানোর চেষ্টা করবে।

- পরিবেশগত ক্ষতি ও দূষণের দ্বায়িত্ব ও ক্ষতিপূরণের বিষয়ে রাষ্ট্রগুলি জাতীয় আইন গড়ে তুলবে। এ ছাড়া তাদের এলাকার মধ্যে কার্যাবলির জন্য পরিবেশগত ক্ষতির দ্বায়িত্ব ও ক্ষতিপূরণ হিসাবে আরও সুনিশ্চিত আন্তজার্তিক আইন গড়ে তুলতে হবে।

- মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে বা পরিবেশের ক্ষতি করে এমন কাজকর্ম বা পদার্থ এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে হস্তান্তর বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সহযোগিতা করবে।

- প্রতিটি রাষ্ট্র নিজ ক্ষমতানুযায়ী পরিবেশগত ঝুঁকি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করবে। যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবকে কারণ হিসাবে দেখিয়ে যেন পরিবশডগত অবনমনকে দীর্ঘায়িত হতে না দেওয়া হয়।

- প্রতিটি রাষ্ট্র এই নীতি গ্রহন করবে যে দূষণকারী দূষণের ব্যয়ভার বহন করবে। এর জন্য সবরকমের পরিবেশগত ব্যয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

- প্রতিটি প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ণ (Environmental Impact Assessment) করা আবশ্যিক করতে হবে। এর জন্য প্রতিটি দেশকে সুদক্ষ সংস্থা গঠন করতে হবে।

- প্রতিটি রাষ্ট্র কোনো বড়ো ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যা অন্য দেশের পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে সে বিষয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রকে অবিলম্বে সূচনা দেবে। আন্তজার্তিক সহায়তার মাধ্যমে প্রভাবিত রাষ্ট্রগুলিকে সবরকম সহায়তা দেওয়া হবে।

- শান্তি, উন্নয়ন ও পরিবেশের সুরক্ষা – এই তিন বিষয় পরস্পর নির্ভর এবং অবিচ্ছেদ্য।

প্রতিটি রাষ্ট্র তাদের সমস্ত পরিবেশগত বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে এবং উপযুক্ত উপায়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চার্টার অনুযায়ী মেটানোর চেষ্টা করবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং স্থিতিশীল সেখানকার অধিবাসীরা পরস্পরের সঙ্গে বিশ্বাস ও সহযোগিতার প্রেরণার মাধ্যমে এই ডিক্লারেশন বর্ণিত নীতিগুলির আদর্শ পূরণে কাজ করবে। এ ছাড়া রিও সম্মেলনে গৃহীত এজেন্ডা 21 (Agenda 21) – একবিংশ শতাব্দির মধ্যে স্থিতিশীল উন্নয়নে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে একটি আন্তজার্তিক কর্মসূচী। 500 পাতারও বেশি এই নথীতে চারটি মূল রাজনৈতিক প্রকল্পের এলাকা চিহ্নিত হয় ঃ

- ❖ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন;
- ❖ প্রাকৃতিক উপকরণ, ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র এবং তৎসম্পর্কিত মানবীয় কাজকর্ম, শিল্পের উপজাত দ্রব্য।
- ❖ প্রধান গোষ্ঠীসমূহ; এবং
- ❖ রূপায়ন উপায়।

৩.৮ সংক্ষিপ্তসার (Summing up) ঃ

শিক্ষার কাজ শিক্ষার্থীর সামাজিক সামর্থক্য বাড়িয়ে তোলা এবং তার জন্য শিক্ষাকে সমাজ অর্থনীতির দিক থেকে বিশ্লেষণ করা উচিত। এই জন্য বর্তমানে শিক্ষার নীতিগুলি তত্ত্বের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হচ্ছে। শিক্ষা বিষয়ক অর্থনীতি হল অর্থনীতির একটি প্রয়োগমূলক শাখা। ‘‘Economics the Science of Welth dealing with human welfare.” শিক্ষা ও একটি মানবকল্যাণের ক্ষেত্র। 1960 খ্রিস্টাব্দে অর্থনীতিবিদ Schultz প্রথম Economics of Education কথাটি ব্যবহার করেন। বলা যেতে পারে – Economics of education is that branch of Economics which is concerned with the welfare programme of education. অধ্যাপক Samuelson বলেছেন, Economics of education is chiefly concrned with the study of growth process combined with social justice.

অর্থনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা। আবার শিক্ষা মানুষের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করে উন্নত মানব সম্পদ সৃষ্টি করে। যার সাহায্যে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব। এদিক দিয়ে শিক্ষা ও অর্থনীতির অবস্থান খুবই নিকট। অর্থনীতি কোন একটি রাষ্ট্রে সুষ্ঠু শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করে। সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে অর্থনীতির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। শিক্ষার ফলে যখন দেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায় তখন সাথে সাথে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ও পরিলক্ষিত হয়। চিন অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে উঠে আসার পেছনে রয়েছে শিক্ষাখাতে প্রচুর ব্যায় এবং একশ শতাংশ সাক্ষরতার হার। প্রায় একই সময়ে স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশ ভারত এ বিষয়ে পিছিয়ে শিক্ষাখাতে কম বিনিয়োগ এবং নিম্নস্বাক্ষরতা হারের কারণে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে অর্থনীতি সর্বদা শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত। পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দুটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান একে অপরকে প্রভাবিত করে। পরিবেশকে জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্য হল স্থিতিশীল এক বিশ্ব গড়ে তোলা, যেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এখনকার উন্নত জীবনযাত্রার ও স্বাস্থ্যের মান নিয়ে জীবনজাতীর অস্তিত্ব বজায় থাকবে। মানুষের জীবন ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু, পৃথিবী থেকে তা যথেষ্ট পরিমানে পাওয়া যাবে। যেমন ধারণযোগ্য পৃথিবীতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের অন্নসংস্থানের জন্য যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে, একই সঙ্গে মাটির উর্বরতাও অক্ষুন্ন থাকবে যাতে পরের বছর আবার যথেষ্ট পরিমানে খাদ্য উৎপাদন করা যায়। প্রতিটি মানুষকে যথেষ্ট পরিমানে পরিচ্ছন্ন জল সরবরাহ করা হবে, আবার সেই সঙ্গে এ’ও দেখতে হবে যাতে পরের বছরে একই পরিমানে পানীয় জল পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না করে দেশ ও দশের মঙ্গল সাধন করা যায় তাকে স্থিতিশীল উন্নয়ন বলে।

স্থিতিশীল উন্নয়ন মানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সীমাবদ্ধতা – এই দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য গড়ে তোলা। স্থিতিশীল উন্নয়নকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে সামাজিক দিকটি গুরুত্ব পায়। সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের হাতে অসমভাবে বন্টিত। এই শ্রেণিগুলি কোন উপকরণ করখানি ব্যবহার করছে, তার কুফল ও সুফল কতখানি পাচ্ছে, উন্নয়নের ফলে এই অনুপাতে কী ধরণের পার্থক্য ঘটছে – এই বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল কথা হল প্রকৃতি কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে – তা নয়, সমাজের কোন্ শ্রেণির মানুষ কিভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে তার উপর।

শুধু তাই নয়, স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ম্যূলবোধের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং স্থানীয় মানুষের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন করলে তা হবে স্থিতিশীল উন্নয়ন।

৩.৯ প্রশ্নাবলী (Questions)

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) শিক্ষামূলক অর্থনীতি বলতে কি বোঝায়?
খ) শিক্ষাবিষয়ক অর্থনীতির দুটি মূল উদ্দেশ্য লিখুন।
গ) অর্থনীতি বলতে কি বোঝেন?
ঘ) স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়?
ঙ) স্থিতিশীল উন্নয়নের উপাদানগুলি কি কি?;

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) শিক্ষামূলক অর্থনীতির বিষয়বস্তুগুলি আলোচনা করুন।
খ) স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য শিক্ষা-ধারণাটি ব্যক্ত করুন।
গ) শিক্ষার অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
ঘ) স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল নীতিগুলি সংক্ষেপে লিখুন।
ঙ) পরিবেশের অবনমনের কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা দিন।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

ক) অর্থনীতি ও আধুনিক শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করুন।
খ) আধুনিক শিক্ষায় অর্থনীতির প্রভাব আলোচনা করুন।
গ) স্থিতিশীল উন্নয়নের উপাদানগুলি বর্ণনা করুন।
ঘ) স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি আলোচনা করুন।
ঙ) 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' ধারণার সমালোচনা করুন।

৩.১০ উৎস (References)

১)	শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি	–	ডঃ উজ্জ্বল পান্ডা
		–	ডঃ স্বপন সেন
		–	ডঃ মিহির চট্টোপাধ্যায়
২)	শিক্ষার সমাজ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি	–	ডঃ সোনালী চক্রবর্তী
৩)	শিক্ষার সামাজিক ভিত্তি	–	ডঃ দেবাশিষ পাল
৪)	Sociology	–	Dr. C. Bhattacharyya

একক : চার

শিক্ষা ও আধুনিকতা

EDUCATON AND MODERNIZATION

গঠন (Structure)

৪.১ সূচনা

৪.২ উদ্দেশ্য

৪.৩ আধুনিকীকরণের ধারণা

৪.৪ আধুনিকীকরণের বৈশিষ্ট্য

৪.৫ শিক্ষায় আধুনিকীকরণের প্রভাব

৪.৬ সংক্ষিপ্তসার (Summing up)

৪.৭ প্রশ্নাবলী (Questions)

৪.৮ উৎস (References)

৪.১. সূচনা (Introduction) :

প্রাচীন জীর্ণতাকে পরিত্যাগ করে আমরা যখন জীবনকে নতুন সাজে সাজিয়ে তুলি, তখন তাকেই বলা হচ্ছে আধুনিকতা। আধুনিকীকরণের মূল সূত্রটি গথিত হয়েছে আন্তজার্তিক বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। যে কোন সমস্যাকে আবেগতাড়িত প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ না করে, বস্তুতান্ত্রিক ভাবে বিচার করাই হল এর এর বিশেষ লক্ষণ। শুধুমাত্র যান্ত্রিকভবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার বা জ্ঞান অর্জন নয়, বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুশীলন পদ্ধতি যখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মননশীলতাকে প্রভাবিত করে, তখন তাকে বলা হয় আধুনিকতা। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মনজগতের মধ্যে এক বস্তুমুখী বিশ্লেষণ করার প্রবণতা গড়ে তোলা। মনোজগতের এই অভিব্যক্তি একজন অতি সাধারণ মানুষকে যেমন আধুনিক করে তুলতে পারে, তেমনি মানসিক অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার অভাব একজন বিজ্ঞানীকেও আধুনিক হবার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। বিজ্ঞান যেমন কোনো একটি বিশেষ সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি বা গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নয়, আধুনিকতাও তেমনি কোন একটি বিশেষ আঞ্চলিক বা গোষ্ঠী কেন্দ্রিক নয়. এটি একটি মানবিক বিষয় এবং এর সার্বজনীন আবেদন আধুনিকতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে বিংশ শতাব্দিতে প্রগতির হার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

আধুনিকতা, আমাদের জীবনযাপনের ধারার পরিবর্তন, চিন্তার অভিব্যক্তি ও মানবীয় সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ধারা বহুমুখী। এই পরিবর্তনের যে ফল আমরা প্রত্যক্ষ করছি, সেগুলি সবই আধুনিক। অন্যদিকে যে প্রক্রিয়ায় এই প্রাচীন চিরাচরিত ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে, তাই হল আধুনিকতা। সুতরাং আধুনিকতা শব্দের মধ্যে গতিশীলতার ধারণা বর্তমান। এই গতিশক্তি বিশ্ব-প্রাণের প্রকাশ তাই থেমে থাকতে পারে না। আধুনিকতা একটি সততপ্রবাহমান প্রক্রিয়া। আধুনিকতার প্রভাবে কৃষি, শিল্প, ধর্ম, সামাজিক বিন্যাস, শিক্ষা ইত্যাদির সমস্ত দিকেরই পরিবর্তন হয়। বস্তুগত ও সংস্কৃতিকে বিভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে।

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives) :

i) এই অধ্যায়টি পড়ার পর শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে জানতে অভিহিত হবেন –

  ক) আধুনিকীকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

  খ) আধুনিকতা যে একটি সততপ্রবাহমান প্রক্রিয়া তা অনুধাবন করতে পারবেন।

  গ) আধুনিকীকরণের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানবেন।

  ঘ) আধুনিকীকরণের শর্তগুলি সম্পর্কে জানবেন

  ঙ) শিক্ষায় আধুনিকীকরণের প্রভাব কতটুকু যে সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

৪.৩ আধুনিকীকরণের ধারণা (Concept of Modernization)

এক শতাব্দির মধ্যে মানব সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে। এই আধুনিকতা, আমাদের জীবনযাপনের ধারার পরিবর্তন, চিন্তার অভিব্যক্তি ও মানবীয় সম্পর্কের পুনবিন্যাসের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়েছে। জীবনযাপনের সুযোগ সুবিধা ও কৌশলের এই পরিবর্তন এত দ্রুত ও লক্ষ্যনীয়ভাবে এসেছে যে, সাধারণ মানুষ আমরা সকলে অবাক। এই পরিবর্তনের ধারা বহুমুখী ও এই পরিবর্তনের যে ফল আমরা প্রত্যক্ষ করছি, সেগুলি সবই আধুনিক। অন্যদিকে যে প্রক্রিয়ায় এই প্রাচীন চিরাচরিত ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে, তাই হল আধুনিকতা। সুতরাং 'আধুনিকতা' শব্দের মধ্যে গতিশীলতার ধারণা বর্তমান। এই গতিশক্তি বিশ্ব-প্রাণের প্রকাশ, তাই থেমে থাকতে পারে না। আধুনিকতা একটি সততপ্রবহমান প্রক্রিয়া।

'আধুনিকীকরণ' এই প্রত্যয়টির সঙ্গে সংযুক্ত আছে উন্নয়ণ প্রক্রিয়ার ধারণা। আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে আর্থসমাজিক ও রাজনৈতিক দিক ও যুক্ত আছে। এই কারণে আধুনিকীকরণের ধারণাকে সংক্ষপে ও সহজে ব্যক্ত করা যায় না। অর্থাৎ 'আধুনিকীকরণ' এর সংজ্ঞা প্রদান সহজসাধ্য নয়।

কোঠারী কমিশনের মতে– গতানুগতিক সমাজ থেকে আধুনিক সমাজের প্রধান পার্থক্য হল, আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানে আস্থাশীল। আধুনিক কৌশল, সামগ্রী এবং পদ্ধতি ব্যবহারে সমস্ত ক্ষেত্রেই উৎপাদনে আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি ঘটেছে। এই ফলিত প্রযুক্তি জ্ঞান সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের উপরেও প্রভাব বিস্তার করেছে যার ফলে এক্ষেত্রেও পৃথক মাত্রা পেয়েছে। এক কথায় বলা যায় যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে আমাদের মধ্যে যে বস্তুগত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে তাকেই আধুনিকীকরণ বলে।

কার্ল ডয়েস (Karl Deutsch) আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি পৃথক শব্দ প্রয়োগ করেছেন। আধুনিকীকরণকে তিনি সামাজিক সচলতা (Social Mobilization) হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতানুসারে আধুনিকীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আগেকার আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্যবোধ সমূহ অবলুপ্ত হয় এবং জনসাধারণ নূতনতর সামাজিক আচরণ ও নূতনতর সামাজিকীকরণ বিন্যাসের ব্যাপারে তৈরী হয়। আধুনিকীকরণের সূচক হিসাবে ডয়েস কতকগুলি বিষয়ের কথা বলেছেন। এই বিষয়গুলি হল নগরায়ণ, যান্ত্রিকীকরণ, বিলাসদ্রব্যের ব্যাপক উৎপাদন ও বহুল ব্যবহার, মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি, স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, গনসংযোগের মাধ্যমগুলির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি, বাসস্থানের পরিবর্তন, বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকার সৃষ্টি ও সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি।

সমাজ বিজ্ঞানী গোরে (M.S. Gore) তাঁর Education and Modernization in India শীর্ষক গ্রন্থে আধুনিকীকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী 'আধুনিককীকরণ' হল একটি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। আগে আধুনিকীকরণ বলতে বোঝানো হত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক আচার ব্যবস্থার উপর তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া। আগেকার ধারণা অনুসারে আধুনিকীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই পরিবর্তন ঘটেছে প্রধানতঃ কৃষি-অর্থনীতি থেকে শিল্প-অর্থনীতিতে। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের সুবাদে সমাজের মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটে। বর্তমান ব্যপকতর অর্থে 'আধুনিকীকরণ' কথাটি ব্যবহার করা হয়। ব্যপক অর্থে বলা হয় যে, আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সংঘটিত সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় যুক্তিবাদী পরিবর্তন সাধিত হয়।

৪.৪ আধুনিকীকরণের বৈশিষ্ট্য ঃ Characteristies of Modernisation

আধুনিকতার প্রভাবে সমাজ-জীবনে বহুমুখী পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া মানুষের জীবনযাত্রার মান ও মূল্যবোধের পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তন সার্বিক। আধুনিকতার পরিবর্তন জনিত সংলক্ষনগুলি পরিস্ফুট করতে গিয়ে শিক্ষাবিদ্ ডোনাল্ড অ্যাডামস বলেছেন – "Technology will change toward the increased application of scientific knowledge; agricultare will move from subsistence farming to cash crops to consumer production. In industry the trend is away from the muscle to the use of machine whic drives power from other forms of energy; in religion there becomes a secularization of belief pattern; in ecological arrangment a movment of urban concentration; in family patterns a reduction is grobith in size and number of functions; in education growth in quality available and variety of curricula offered." অর্থাৎ আধুনিকতার প্রভাবে কৃষি, শিল্প, ধর্ম সামাজিক বিন্যাস, শিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত দিকের পরিবর্তন হয়। সমাজ-তাত্ত্বিকগন আধুনিকতাকে কয়েকটি সামাজিক সংলক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। আধুনিকতার এই সংলক্ষণগুলিকে আমরা তার বৈশিষ্ট্য বলে থাকি। আধুনিকরণের এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল–

১) সমাজবিদ্গন মনে করেন, সামাজিক বিবর্তনে, চিন্তাবিদ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ এবং দার্শনিকেরা সক্রিয়া ভূমিকা গ্রহন করে থাকেন। আধুনিকতার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি নেতৃত্ব দিয়েছেন। কেউ মানুষের চিন্তা-জগতে পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন, কেউ-বা সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তন চেয়েছেন, আবার কেউ বা জীবনযাত্রার কৌশলের পরিবর্তন আনার উপরগুরুত্ব আরোপ করেছেন, এই সব ব্যক্তিদের আধুনিকতার অগ্রণী পুরুষ (innovetors) বলা হয়। হাগেন (E.Hagen) , লার্নার (Lerner) প্রভৃতি সমাজতত্ত্ববিদ্গন এঁদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন – "Such men are marginal, lacking an identification with the dominant groups and ready to start a new way of life." গীতায় বলা হ'য়েছে, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবিভূত হন। এই সকল অগ্রণী পুরুষদের সংস্কার-প্রচেষ্ঠার সফলতা নির্ভর করে তাদের ব্যক্তিগত প্রভাবের উপর। এই রকম মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি ধীরে ধীরে নিজেদের কেন্দ্র ক'রে অন্যান্যদের সমবেত করতে সক্ষম হন। এই অবস্থায় আধুনিকতা-প্রক্রিয়ার একটি স্থায়ী রুপ আমরা দেখতে পাই। এই কারণে আধুনিক সমাজবিদ্গণ মনে করেন, আদর্শগত উদ্যোজন (Mobilization) আধুনিকতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই উদ্যোজনের প্রভাব এক সময় সমগ্র সমাজের উপর এসে পড়ে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে যখন একটি আদর্শের দ্বারা এমনিভাবে অনুপ্রাণিত করা যায়, তখনই আধুনিকতার পরিপূর্ণ রুপ প্রত্যক্ষ করা যায়। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা এই ধরণের সঞ্চালন প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে লক্ষ্য করতে পারি। কোথাও অর্থনৈতিক, কোথাও রাজনৈতিক, কোথাও বা ধর্মীয় আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে জন-জীবনের উদ্যোজন হ'চ্ছে। বর্তমান সমাজ এই অর্থেই আধুনিক।

২) সমাজ জীবনের আদর্শ-কেন্দ্রিক উদ্যোজন একবার শুরু হ'লে, তা ধীরে ধীরে চলতে থাকে। এর প্রভাবে মানুষের স্থায়ী যে-সব মনোভাব (Attitude) গড়ে উঠেছিল, সেগুলির পরিবর্তন হতে থাকে। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ যে পরিমান ঐশ্বরিক ক্ষমতার উপর বিশ্বাস করতো, বর্তমানে তা আর করে না। বর্তমানে তারা

মানুষের ক্ষমতার উপর অপেক্ষকৃত বেশী আস্থাবান। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় সমাজিক নিয়ন্ত্রনের জন্য পরিবারের (Family) উপর যে পরিমানে দায়িত্ব আরোপ করা হ'ত, বর্তমানে তা আর করা হয় না। সামাজিক নিয়ন্ত্রনের (social control) জন্য বর্তমানে নতুন নতুন সমাজিক সংস্থা গড়ে উঠেছে এবং তাদের উপর অপেক্ষকৃত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এমনিভাবে আধুনিকতার প্রভাবে মানুষের বিশ্বাস ও মনোভাবের পরিবর্তন (Change in attitude and belief) হ'চ্ছে। মানুষ সার্বিকভাবে পরিবর্তনে আগ্রহী হ'য়ে উঠেছে। তাই এই পরিবর্তন-অভিমূখীতা আধুনিকতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

৩) আধুনিকতার প্রভাবে সামাজিক সংগঠনের বিভেদীকরণের (Differentiation) হচ্ছে; নতুন নতুন সংস্থার (institution) সৃষ্টি হচ্ছে। গতানুগতিক প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার (family) এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious institution) ব্যক্তির সকল রকম নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহন করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু বর্তমান মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ জটিলতা লাভ করছে। এই জটিল জীবন ক্ষেত্রে মানুষের সকল রকম সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র পরিবার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, সমাজের মধ্যে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত নতুন নতুন সংস্থা গড়ে উঠ্‌ছে এবং তারা সুষ্ঠ ভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বহুমুখী সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হচ্ছে। মানুষ এই সকল সংস্থার প্রতি ক্রমেই বেশী আস্থাবান হয়ে পড়েছে। তার এই নির্ভরশীলতার মনোভাব, নতুন নতুন সংস্থাগুলিকে দায়িত্ব দান করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংগঠনের মধ্যে বিভেদীকরণের প্রক্রিয়াকে আরও সক্রিয় ক'রে তুলছে। এর ফলে আমরা আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় সাংগঠনিক বিভাজন লক্ষ্য করছি। শিপম্যান (Shipman) আধুনিকতার এই বিভেদীকরণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন – "Moderrn society is a world of organisations. In politics, religion, occupation, economy, social welfare and leisure, Organisations have proliferated to enable people to solve the problems of living."

৪) আধুনিকতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে সাংঠনিক বিভেদীকরণের প্রক্রিয়ারও অগ্রগতি হচ্ছে। আর এই বিভেদীকরণের প্রভাবে শ্রম বন্টনের প্রথার পরিবর্তন হচ্ছে; সমাজের মধ্যে বিশেষতঃ ব্যক্তিদের প্রাধান্য বাড়ছে। মানুষেরও বিশেষ জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। গতানুগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মসংস্থাগুলি এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। নতুন নতুন জ্ঞান আহরণের জন্য ব্যক্তিকে বাসস্থান ছেড়ে বহুদূরে যেতে হচ্ছে। কর্ম-সংস্থানের জন্যও নিজের একান্ত সমাজ-পরিবেশকে ত্যাগ করতে হচ্ছে। ফলে নতুন নতুন ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে। এই সংযোগ গতানুগতিক মানবীয় সম্পর্কের (Human relationship) রীতির মধ্যে পবিবর্তন আনছে। তাই সমাজের মধ্যে বিশেষজ্ঞের উদ্ভব এবং মানবীয় সম্পর্কের পরিবর্তন, এই দুইই আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য।

৫) আধুনিকতার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল জীবনদার্শের পরিবর্তন। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরণের নতুন নতুন সামজিক সংস্থা (social institution) গড়ে উঠেছে। এই প্রত্যেকটি সংস্থা নিজের নিজের আদর্শের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করছে। কিন্তু, বর্তমান জটিল জীবন পরিস্থিতিতে মানুষ কোন একটি বিশেষ সংস্থা দ্বারা এককভাবে প্রভাবিত হয়, একথা বলা যায় না। সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে, ফলে, বিভিন্ন আদর্শ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে তাকে কাজ করতে হয়। কিন্তু এই সব আদর্শের পারস্পরিক বিরোধ সে মনে ধরে রাখে না। তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তায় সামঞ্জস্য বিধান ক'রে একক জীবনাদর্শ গড়ে তোলে। আধুনিকতার প্রভাবে

মানুষের জীবনে বিশৃঙ্খলা আসে, এ ধারণা ঠিক নয়। বরং তার প্রভাবে ব্যক্তি-জীবনে উন্নত ধরণের একক জীবনাদর্শ গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। শিপম্যান (Shipman) আধুনিকতার এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন – "Modern man learns to accomodate the complexity and in doing so acquires a personality that is different from his predecessors." যে ব্যক্তি সব কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একক জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে পারে না, তার জীবনে অপসঙ্গতি দেখা দেয়।

৬) আমরা জানি, আধুনিকতার প্রভাবে সমাজ-জীবনে বিভিন্ন দিকে পবিবর্তন এসেছে। জীবনযাপনের সুযোগ-সুবিধার পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন বিশেষ ভাবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সকল পরিবর্তন মানুষকে আধুনিকতার দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু, আধুনিকতা জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিকের উন্নতি আনলেও তার সুষম বন্টনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেনি। ফলে, মানুষের মধ্যে এই সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। এই ক্ষোভ নানাভাবে তাদের আচরণের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে – কখনও বা রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে আর কখনও ধর্মীয় বিদ্বেষের মাধ্যমে। তাই আধুনিকতার প্রভাবে ব্যক্তিমানের উন্নতির হ'লেও তার খারাপ প্রভাবও মানুষের মনকে বিদ্রোহী ক'রে তুলছে। সামাজিক অব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব তাই আধুনিকতার অনুসঙ্গ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

আধুনিকতার উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে এই কথায় প্রমানিত হয় যে, এই প্রক্রিয়া সামাজিক জীবনে সামগ্রিক পরিবর্তন সংগঠিত ক'রেছে। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র বাহ্যিক আচরণ বা জীবন যাত্রার বাহিরঙ্গের নয়; এই প্রক্রিয়া জীবনের প্রতি মানুষের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করেছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক এস.এন.মুখার্জী আধুনিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন – "It is essentially a process, a movement from traditional or quasi-traditional order to certain desired type of technology and associated forms of social structure, value orientation, motivation and norms."

৪.৫ শিক্ষায় আধুনিকীকরণের প্রভাব ঃ Influence of modernization in Education

শিক্ষায় আধুনিকীকরণের প্রভাব ঃ

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল একটি সামাজিক প্রক্রিয়া (social process)। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সমাজীকরণ হয়; অর্থাৎ, ব্যক্তিসত্ত্বার সামজিক দিকের বিকাশ হয়। এই অর্থে শিক্ষালগুলিও এক-একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করেছি, আধুনিকতার প্রভাবে আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন হচ্ছে। আধুনিকতার প্রভাব শিক্ষার উপরও এসে পড়েছে। আধুনিকতার প্রভাবে অন্যান্য সামাজিক সংস্কার মত শিক্ষা-সংস্থারও নান রকম পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তন বহুমুখী। শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা এই বহুমুখী পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করতে পারি। এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষ কয়েকটির কথা উল্লেখ করা যাক।

প্রথমত ঃ, আধুনিক শিক্ষায়, শিক্ষা-সম্পর্কিত গতানুগতিক ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। জীবন সম্পর্কে বিস্তৃত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার গতানুগতিক ধারণার পরিবর্তনের সহায়তা করেছে। শিক্ষা আধুনিক অর্থে জ্ঞান সংগ্রহের কৌশল নয়; বৃহত্তর জীবনবিকাশের প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয়ত ঃ, আধুনিকতার প্রভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যগত পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যাবলীর বিকাশ শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সামাজিক বিকাশও। অর্থাৎ, শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সামাজিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এই কারণে, কোন নির্দ্দিষ্ট সমাজে আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সেই সমাজের সার্বিক উদ্দেশ্য সাধারনেরই সামিল। ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্টে তাই আমরা দেখি, শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে, তাকে জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ, আধুনিকতার প্রভাবে শিক্ষার পাঠক্রমের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের উপর কেবল মাত্র গুরুত্ব দেওয়া হত। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন জীবনবিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আধুনিক পাঠক্রমে জ্ঞানের বিস্তৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একদিকে যেমন অতিরিক্ত নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত করা হয়েছে, অন্যদিকে জীবনবিকাশের উপযোগি বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীকে অন্তভূক্ত করা হয়েছে। আধুনিকতার প্রভাবে ব্যক্তিজীবনে যে সব নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলি উপযুক্ত পদ্ধতিতে নিবৃত্ত করার জন্য পাঠক্রমকে বিস্তৃত করতে হ’য়েছে।

চতুর্থত ঃ, আধুনিকতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার জন্য বর্তমানে অধিক পরিমানে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কৌশল প্রয়োগ করা হয়। আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নি। শিক্ষণ (Teaching) বর্তমানে এটি বৃত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষন প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তোলার জন্য বর্তমানে তাই বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কৌশলের প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে পদ্ধতি-বিজ্ঞান (Methodology) ও শিক্ষামূলক কারিগরী বিদ্যার (Instructional technology) উদ্ভব হয়েছে। এই সকল ব্যবস্থা শিক্ষকের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তোলায় সহায়তা করেছে।

পঞ্চমত ঃ, আধুনিকতার প্রভাবে শিক্ষণ-কৌশলের পরিবর্তন শুধুমাত্র যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছে, একথা ঠিক নয়। শিক্ষণের ক্ষেত্রে আরও এক দিক্ থেকে পরিবর্তন এসেছে। আধুনিকতার প্রভাবে, জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণের উৎপাদন-পরিমানও বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনের এই তাগিদের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাকেও জীবনকেন্দ্রিক করার চেষ্টা চলছে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে, শিক্ষার্থীরা যাতে জীবনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে।

ষষ্ঠত ঃ, আধুনিকতার প্রভাবে শিক্ষাগত সুযোগের (Educational opportunity) পরিবর্তন হয়েছে। গতানুগতিক সমাজ-ব্যবস্থায়, শিক্ষা কেবলমাত্র এক শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও ছিল অনেক কম। এই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমের মধ্যে বৈচিত্র বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু, আধুনিকতার প্রভাবে জীবনধারণের দাগিদেই মানুষের শিক্ষার চাহিদা বেড়েছে। এই চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য বর্তমানে অধিক সংখ্যক শিক্ষালয় স্থাপন করা হচ্ছে এবং ঐসব শিক্ষালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে বৈচিত্র আনা হচ্ছে।

সপ্তমত ঃ, আধুনিকতা, সামাজিক অভিব্যক্তিরই নামান্তর। এই প্রক্রিয়ার প্রভাবে সমাজের মধ্যে মানবীয় সম্পর্কের (Human relationship) পরিবর্তন সংগঠিত হচ্ছে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির আধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ফলে, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব চাহিদা ও মতামতের উপর উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া

আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। এর ফলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সম্পর্ক শিক্ষা-পরিবেশের মধ্যে নতুনত্ব এনেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিকতার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রায় সব রকম বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে হয়। আমরা উদাহরণ স্বরূপ যে কয়েকটি দিকের কথা উল্লেখ করলাম, তার থেকেই প্রমানিত হয় যে, আধুনিকতার প্রভাবে শিক্ষা-সংস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। তাই এই দিক্ থেকে বিচার ক'রে বলা যায়, আধুনিকতা ও শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব শিক্ষার উপর এসে পড়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। সিপ্ ম্যান (M.D Shipman) বলেছেন – "As the rate of social change increased, in modern societies, the presure on education to change increas rapidly" এই দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে বিচার করে বলা যায়, আধুনিকতার প্রক্রিয়া সমাজ-জীবনে শুরু হলে, তার প্রত্যক্ষ প্রভাব শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর এসে পড়ে এবং তার ফলে শিক্ষার পরিবর্তন হয়। এটাই হল শিক্ষার উপর আধুনিকতার প্রভাব।

কিন্তু, এছাড়াও, শিক্ষা আধুনিকতা সম্পর্কের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তাবিদ্‌গণ মনে করেন, আধুনিকতার প্রভাবে শিক্ষার যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি শিক্ষাও আধুনিকতার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। যে কোন আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা বা যে কোন ধরণের সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা রচনা করা না যায়, তাহলে সম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থায় ভেঙ্গে পড়বে। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ জীবনের সংরক্ষণ ও অগ্রগতিতে সহায়তা করে। শিক্ষাই আধুনিকতার প্রক্রিয়াকে কার্যকর ক'রে তোলে। হারবিসন্ ও মায়ার্স (F. Harbison, C.A. Mayers) বলেছেন, "Education in the key that unlocks the door to modernization." তাছাড়া, আধুনিকতার প্রভাবে যে সকল সামাজিক পরিবর্তন হয়, সেগুলিকে স্থিতিশীল করার জন্য শিক্ষা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের কাছে সমস্যা হল আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষাকে কিভাবে পুনর্বিন্যাস করলে সবচেয়ে বেশী সুফল পাওয়া যাবে। আধুনিকতার বিশেষ কোন্ দিক্‌গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার পুনবিন্যাস করা দরকার? এই সমস্যার সমাধান করতে হলে, আধুনিকতার সামাজিক তাৎপর্যের দিক নজর দরকার। আমরা জানি, আধুনিকতা এক ধরণের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। তাই শিক্ষাকে আধুনিকতার অনুকূলে সক্রিয় করে তুলতে তাকে এমন ভাবে পুনর্বিন্যাস করতে হবে, যাতে আধুনিকতার প্রবাহমান অবস্থা বজায় থাকে। অন্য দিকে আধুনিকতার একটি বৈশিষ্ট্য হল বহুমুখী পরিবর্তন। আধুনিকতার প্রভাবে সমাজ-জীবনে বহু পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে এই সকল পরিবর্তনের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে, সে বিষয়ে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব শিক্ষাকে গ্রহন করতে হবে। অর্থাৎ 'আধুনিকতার জন্য শিক্ষা'র মূল নীতি হবে–

১) সমাজে আধুনিকতার প্রবাহকে বজায় রাখতে সহায়তা করা, এবং ২) আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তির অভিযোজনে সহায়তা করা। এই দুটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত কৌশলগুলি অবলম্বন করতে পারি।

এক – আমরা জানি, আধুনিকতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উদ্‌যোজন। সমাজের মধ্যে আধুনিকতার প্রবাহ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির ইচ্ছায় শুরু হয়। এই সব ব্যক্তিরা গতানুগতিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন, এবং নতুন কোন ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। পরবর্তীকালে, এই সকলব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, সামাজিক উদ্‌যোজন

প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই উদ্‌যোজনের ফলে যখন সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত প্রকাশিত হয়, তখনই আধুনিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং এই আলোচনা থেকে বলা যায়, আধুনিকতার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন। যে ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে কোন বিষয়ের উপর অভিমত প্রকশ করতে পারেন, যিনি বিশ্লেষণমূলক চিন্তন দ্বারা জীবনের যে-কোন সমস্যা স্বাধীনভাবে সমাধান করতে পারেন এবং যিনি চারিত্রিক বৈশিষ্টে্য অন্যান্যদের উর্দ্ধে, তিনিই এই ধরণের নেতৃত্ব দিতে পারেন। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলি আনতে পারে। তাই আধুনিকতা কার্যকরী করতে হলে শিক্ষার আদর্শগত পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যে হবে ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে চিন্তনের অধিকারী করা। শিক্ষাকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিকাশের কৌশল হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে যে-কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে নিজের বিশ্লেষণাত্মক চিন্তন-প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারে, তার প্রশিক্ষন শিক্ষালয়গুলিতে গিতে হবে। এই প্রশিক্ষন যদি সঠিকভাবে কার্যকর হয়, তবেই আধুনিকতার প্রবাহকে ধরে রাখা সম্ভব হবে অভিযোজন করাও ব্যক্তির পক্ষে সহজ হবে।

দুই – আধুনিকতার প্রভাবে, আমাদের গতানুগতিক সামাজিক সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তন আসে। যে-সব সামাজিক সংস্থা পূর্বে ব্যক্তির আচরণধারাকে সুনিয়ন্ত্রিত করত, বর্তমানে তাদের শক্তির হ্রাস পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে পরিবার ও ধর্মীয় সংস্থার কথা উল্লেখ করা যায়। পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন হচ্ছে, ধর্মের বন্ধন অনেক শিথিল হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, উপযুক্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রন ছাড়া সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কিন্তু, আধুনিকতার অর্থ বিশৃঙ্খলা নয়। বরং আধুনিকতার প্রভাবে সমাজ আরও সুসংহত হয়। এই সংহতি নতুন নতুন সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে আসে। তাই আধুনিকতার প্রতি যথাযোগ্য মনোভাব গড়ে তুলতে না পারলে তার প্রভাব স্থায়ী হবে না। কেবলমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমাজ-সংস্থানগুলির প্রতি স্থায়ী মনোভাব জাগ্রত করা যায় এবং তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধও জাগ্রত করা যায়। সামাজিক সংস্থানগুলির দায়িত্বের পৃথকীকরণের দরুন সমাজ-জীবনে যে বিশঋঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তা দূর করতে হলে, শিক্ষালয়গুলিতে সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষালয়গুলি এই দ্বায়িত্ব যদি উপযুক্ত ভাবে পালন করতে না পারে, তাহলে আধুনিকতার খারাপ প্রভাবই প্রকট হয়ে উঠবে।

তিন – আমরা জানি, আধুনিকতার প্রভাবে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষজ্ঞদের সৃষ্টি হয়েছে। গতানুগতিক মানবীয় সম্পর্কের ধারণার প্রবর্তন হয়েছে। পূর্বে মানুষের মেলামেশা বিশেষভাবে তার পরিবার ও গোষ্ঠীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে জটিল জীবন-পরিস্থিতির বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য এবং নিজেদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য মানুষকে বিভিন্ন রুচি ও কৃষ্টি সম্পূর্ণ দলের মধ্যে মিশতে হচ্ছে। ব্যক্তিজীবনের সফলতা এই সকল দলের মধ্যে অভিযোজনের উপর নির্ভর করে। আধুনিকতা ব্যক্তির দিক্ থেকে নতুন অভিযোজন কৌশল, নতুন ধরেণর পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের দাবী করে। এই ধরণের সুস্থ মানবীয় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। যে-সব দেশে আধুনিকতাকে আপাতঃভাবে দেখা হয়েছে, সেখানে শিক্ষাকে বিশেষ ভাবে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির কাজে লাগানো হয়েছে। ফলে, এই শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা কর্মকেন্দ্রিক বিশেষ জ্ঞান লাভ করলেও জীবন পরিস্থিতিতে তারা স্বাভাবিকভাবে অভিযোজন করতে পারছে না। তাই আধুনিকতার ধারাকে বজায় রাখতে হলে, বিশেষজ্ঞের

প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করা আধুনিকতার উদ্দেশ্য নয়, তাকে উন্নততর মানবীয় গুণের অধিকারী করে তোলাই তার উদ্দেশ্য। তাই আধুনিকতার প্রবাহকে বজায় রাখতে হলে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে উন্নততর মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষালয়ে মানবীয় জ্ঞান (Humanities) সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অভিযোজনের উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে হবে। কারণ, অনিয়ন্ত্রিত কর্মক্ষমতার বিকাশ মানুষকে সাধারণ পশুর স্তরে নামিয়ে নিয়ে আসবে।

চার – আধুনিকতার প্রভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন হচ্ছে। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত বন্টন ব্যবস্থার বিন্যাস হচ্ছে না। ফলে, মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে। বিশেষভাবে উন্নয়ণশীল দেশগুলিতে (Developing Countries) এই ধরণের অসন্তোষ নানা রকম বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। কিন্তু একথা আমাদের ভুললে চলবে না, যে-কোন সমাজ ব্যবস্থাতেই কৃষ্টিগত পশ্চাৎবর্তিতা (cultural lag) থাকবেই। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী উন্নতির সঙ্গে সমান তালে আনুপাতিক হারে কৃষ্টিগত অগ্রগতি হতে পারে না। কৃষ্টিগত অগ্রগতির জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী সময়ের প্রয়োজন। সুতরাং বস্তুনির্ভর আধুনিকতা ও কৃষ্টিগত আধুনিকতার মধ্যে যে-কোন পর্যায়ে কিছু পার্থক্য থাকবে। বস্তুগত আধুনিকতার ধারাকে বন্ধ করে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের কোন এক সময়ে হয়তো সমপর্যায়ে আনা যেতে পারে। কিন্তু তাও সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক ধারণা। সুতরাং প্রাকৃতিক যে বৈষম্য, তাকে মেনে নিতেই হবে। তাই এমত অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির উপযুক্ত সহনশীলতা প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে সচেতন করে তোলা যায়। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের (Social Science) জ্ঞান শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে সহায়তা করবে। তাই আধুনিকতার জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনায় সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

পাঁচ ঃ আধুনিকতার প্রভাবে মানুষের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। উন্নয়ণশীল দেশসমূহে সাধারণ নাগরিকদের ধারণা, শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা যায়, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনা যায়। তাই শিক্ষার চাহিদা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। ফলে, নতুন নতুন শিক্ষালয় গড়ে উঠছে। কিন্তু, এই সব শিক্ষালয় মানুষের প্রকৃত চাহিদা তৃপ্তি করতে সক্ষম হচ্ছে না। কারণ, এই সব শিক্ষালয়ের পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত নয়। আধুনিকতার সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে এই সব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি। মানুষের তাৎক্ষণিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য এইগুলি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, এই সব শিক্ষালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে, তা আধুনিকতার প্রবাহকে বজায় রাখতে সহায়তা করছে না। আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সংস্থার (UNESCO) একটি রিপোর্টে এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে – "Despite spectacular educational expansion, hundreds of millions of the world's children ...... are not getting the education they need. ... Boys and girls who are in school today will spend a great part of their adult lives in the 21st century, yet many of them are being educated by methods and institutions which were developed in the 19th Century or even earlier." এই কারণে আধুনিকতার জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করতে হলে, তারও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। উদ্দেশ্য (Objective), পদ্ধতি (Method), বিষয়বস্তু (Subject Matter) ইত্যাদির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে শিক্ষাকে পুনবিন্যস্ত করলে তবেই তা সামাজিক পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহন করতে সক্ষম হবে।

৪.৬. সংক্ষিপ্তসার ঃ (Summing up)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চরম উন্নতির ফলে বিংশ শতাব্দিতে প্রগতির হার আশ্চর্যজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিকীকরণ হল সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাযুক্ত উন্নত পশ্চিমী দেশসমূহের প্রযুক্তিগত কলাকৌশল, সামাজিক সংগঠনে সাবেকী ও প্রাক্ আধুনিক সমাজের রূপান্তর বা সামগ্রিক পরিবর্তন। অধ্যাপক উইলবার্ট মূরের মতানুসারে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক অগ্রগতিকেই অনুসরণ করে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি যদিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবুও একেই আধুনিকতার একমাত্র মানদন্ড হিসাবে দেখানো যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ এব্যাপারে সমাজের বিদ্যালয়, সমাজ, রাষ্ট্র সকলের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

আধুনিকীকরমের পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য। আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

১) আদর্শগত উদযোজন; (২) পরিবর্তন অভিমুখীতা; (৩) সামাজিক সংগঠনের বিভেদীকরণ ; (৪) বিশেষজ্ঞের উদ্ভব এবং মানবীয় সম্পর্কের পরিবর্তন; (৫) জীবনাদর্শের পরিবর্তন; (৬) বিজ্ঞান মনস্কতা; (৭) ধর্মনিরপেক্ষতা (৮) মনোভাব, মূল্যবোধ ও রীতিনীতির সামগ্রিক পরিবর্তন; (৯) গতিশীল ব্যক্তিত্ব; (১০) জাতি, ধর্ম, ভাষা, আত্মীয়-পরিজন ও অঞ্চলগত স্বার্থের পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থের প্রাধান্য।

আধুনিকতা ও শিক্ষা দুটি পরস্পর ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়া। আধুনিকতার প্রক্রিয়া যেমন শিক্ষাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে এবং তা আধুনিকীকরণে সহায়তা করে, তেমনি উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাব দ্বারা আধুনিকতার প্রবাহকে বজায় রাখা যায়। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যক্তিকে গতানুগতিক চিন্তাধারার বন্ধন থেকে মুক্ত করে, আধুনিক ভাবধারা প্রবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে। আধুনিক শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার বিশ্বায়ন এবং আঞ্চলিকীকরণ। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে মানুষের অস্তিত্ব বিশ্বজনীনতার মাত্রা পেয়েছে। শিক্ষা আজ ভৌগোলিক সীমানার বাধা অতিক্রম করেছে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটেছে যা শিক্ষাকে এক নতুন পথের সন্ধন দিয়েছে।

আধুনিকীকরণের প্রভাব শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন এনেছে। বর্তমানে স্বয়ং-শিখনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বব্যাপী শিক্ষা গবেষণায় প্রমানিত হয়েছে যে, শিক্ষা পদ্ধতি জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে, কিভাবে জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপিত হবে তা জানা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মুখস্তবিদ্যা প্রয়োগের পরিবর্তে শিখন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষণের মধ্যদিয়ে জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষকের ভূমিকা ‘টাস্ক-মাষ্টার’ নয়, শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে জানার ইচ্ছা, সক্রিয়তা জ্ঞানের প্রতি অনুভূতিশীল হওয়া ইত্যাদি সঞ্চারে সহযোগিতা করাও শিক্ষকের কাজ। তিনি শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ থাকবেন না। সমগ্র সমাজ হবে আধুনিক শিক্ষার শ্রেণিকক্ষ। বর্তমান সময়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি এবং বিজ্ঞানের বিস্ফোরণ। শিক্ষককে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং সমাজের চাহিদাকে স্মরণে রেখে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিকীকরণ হল পরিবর্তনের কে সাধারণ প্রক্রিয়া। এই

প্রক্রিয়ার প্রাসঙ্গিকতা সামাজিক ও গোষ্ঠীগত ক্ষেত্রের মত ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্য হল সমাজের সকলের জন্য এক সুন্দর জীবনযাত্রার মানকে সুনিশ্চিত করা এবং ব্যাপকতর অর্থে আধুনিকীকরণ বলতে মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন বোঝায়।

প্রশ্নাবলী ঃ (Questions)

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) আধুনিকীকরণ বলতে কি বোঝায়?

খ) ব্যাপক অর্থে আধুনিকীকরণ বলতে কি বোঝায়?

গ) কোঠারী কমিশনের মতে আধুনিকীকরণ কি?

ঘ) আধুনিকীকরণের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

ঙ) শিক্ষায় আধুনিকীকরণের প্রভাব বলতে কি বোঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) আধুনিকীকরণের ধারণাটি ব্যক্ত করুন।

খ) আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য বলতে কি বোঝায়?

গ) আধুনিকীকরণের শর্তগুলি কি কি?

ঘ) আধুনিকীকরণে শিক্ষকের ভূমিকা কি?

ঙ) আধুনিকীকরণে অন্ধ অনুকরণ নয় কেন?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ-

ক) আধুনিকীকরণের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

খ) শিক্ষায় আধুনিকীকরণের প্রভাব পর্যালোচনা করুন।

গ) আধুনিকীকরণের বিভিন্ন সমস্যাগুলি আলোচনা করুন।

উৎস ঃ- (Referances)

১) শিক্ষার সামাজিক ভিত্তি – ডঃ দেবাশিষ পাল

২) শিক্ষার সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি – ডঃ সোনালী চক্রবর্তী

৩) শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন – অধ্যাপক সুশীল রায়

৪) Sociology – D.C. Bhattacharyya

একক : পাঁচ

শিক্ষার বিভিন্ন রূপ ও সংস্থাসমূহ

FORMS AND AGENCIES OF EDUCATION

গঠন (Structure)

৫.১ সূচনা

৫.২ উদ্দেশ্য

৫.৩ প্রথাগত শিক্ষা

৫.৪ প্রথাগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

৫.৫ অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা

৫.৬ প্রথাবহির্ভুত শিক্ষা

৫.৭ জীবনব্যাপী শিক্ষা

৫.৮ বয়স্ক শিক্ষা

৫.৯ দূরাগত শিক্ষা

৫.১০ শিক্ষার সংস্থা হিসেবে বিদ্যালয়

৫.১১ শিক্ষার সংস্থা হিসেবে গৃহ

৫.১২ শিক্ষায় গণমাধ্যম

৫.১৩ সংক্ষিপ্তসার

৫.১৪ প্রশ্নাবলী

৫.১৫ উৎস

৫.১. সূচনা (Introduction) :

সমাজ জীবনের বিকাশ ও উন্নয়ন এবং ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ব্যক্তিসত্তার নিয়ন্ত্রনের উপর। প্রত্যেক সমাজেরই কিছু না কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা আছে যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে মেনে চলতে হয়। সমাজ জীবনের নিয়ম ও আদর্শ মেনে চলার মাধ্যমেই ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই বিকাশ হয়। সমাজ জীবনের নিয়ম আদর্শ ব্যক্তিকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সমাজের মধ্যেই কিছু কিছু নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থার সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই সব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হল আচরণকে সুনিয়ন্ত্রিত করে সমাজ নির্নীত পথে পরিচালিত করা। শিক্ষা সমাজে এমনিই নিয়ম পালন করে। শিক্ষা হল প্রগতিশীল ও পরিবর্তনশীল বিমূর্ত ধারণা। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর অনুশীলন চলে। গৃহ, বিদ্যালয়, নানারকম সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই শিক্ষার বিভিন্ন কাজ চলতে থাকে এবং তা আমাদের জীবন পথে যথোপযুক্ত যোগ্যতা অর্জনে আমাদের সাহায্য করে। শিক্ষা হল একটি জীবনব্যাপী মানবিক প্রয়াস। প্রত্যেক সমাজেরই কিছু-না-কিছু রীতি নীতি আচার আচরণ, চিন্তাধারা এবং অভিজ্ঞতা আছে, যা সে তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চায়। তাছাড়া, যে সব অভিজ্ঞতা সে দুঃসাধ্য পথে অর্জন করেছে, তাও তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য সহজলভ্য করতে চায়। এই সব দিক থেকেই শিক্ষার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। সুনাগরিক ও আদর্শ চরিত্র গঠন করার মতো একটি চ্যালেঞ্জ সার্থক ভাবে মোকাবিলা করার জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষা ছাড়া আমাদের জীবনে কোন ক্ষেত্রেই অগ্রগতি বা সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক বিশ্বে শিক্ষাই জনহনের সমৃদ্ধির মাত্রা, কল্যাণ এবং নিরাপত্তা দান করে। প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় তার সৃস্টির ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরণের সামাজিক প্রতিষ্ঠান যারা সমাজের সৃষ্টি করতে হয়। এই ধরণের সামাজিক প্রতিষ্ঠান যারা সমাজের উন্নত সংস্কার ও কৃষ্টির পরবর্তী বংশ ধরদের মধে সঞ্চারণের দ্বায়িত্ব নিচ্ছে, তাদের আমরা শিক্ষার সংস্থা বলি। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। শিক্ষার সংস্থাগুলিকে অর্থাৎ যে উৎস থেকে আমরা শিক্ষা অর্জন করে থাকি তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

শিক্ষার বিভিন্ন সংস্থা

- অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা সংস্থা
  - পরিবার
  - সামাজিক প্রতিষ্ঠান
  - গণমাধ্যম
  - উৎপাদন মূলক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র
- নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা সংস্থা
  - বিদ্যালয়

৫.২ উদ্দেশ্য (Objectives) :

এই অধ্যায়টি পড়ার পর শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে অভিহিত হবেন –

ক) শিক্ষার বিভিন্ন রূপ ও সংস্থাসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

খ) প্রথাগত শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করবেন।

গ) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা এবং প্রথাবহির্ভূত ধারণা লাভ করবেন।

ঘ) জীবনব্যাপী শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

ঙ) দূরাগত শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন।

চ) শিক্ষায় গনমাধ্যমের ভূমিকা কি তা জানবেন।

৫.৩ প্রথাগত শিক্ষা (Formal Education)

বিশ্বে বহু শতাব্দী ব্যাপী প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত। শিক্ষার চারটি মৌলিক উপাদানের সঙ্গে আমারা পরিচিত। শিক্ষক- শিক্ষার্থী-পাঠক্রম এবং বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় উক্ত চারটি উপাদানই সুনিয়ন্ত্রিত। কারা কোন কাজ করবে, শিক্ষকের যোগ্যতা ও কর্তব্য, কোন সময়ে শ্রেণির কাজ শুরু ও শেষ হবে, নিদ্দিষ্ট পাঠক্রম, বিদ্যালয়ের স্থান ইত্যাদি সবই নির্দিষ্ট। শিক্ষামূলক কর্মসূচী পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষা সংস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এবং কিভাবে তা পরিচালিত হবে তার নির্দিষ্ট নিয়ম রীতি আছে। অর্থাৎ, প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা হল সেই প্রকৃতির শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষার উপাদানগুলি নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে নিজ নিজ দ্বায়িত্ব পালন করে।

P.D. Shukla-র মতে, প্রথাগত শিক্ষা হল গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে নিয়মিত সাক্ষাৎ হয়। পূর্ব নির্ধারিত পাঠ্য সূচির মাধ্যেমে পাঠদান করা হয়। পাঠক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর সকলের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং সফলতা অনুযায়ী যথাযথ প্রশংসাপত্র, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি দেওয়া হয়।

এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণত চাহিদাভিত্তিক। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার উদাহরণ।

৫.৪ প্রথাগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ঃ

বিধিবদ্ধ শিক্ষার ইতিহাস পর্যালচনা করলে দেখা যায় যে, সমাজ তারা নিজের প্রয়োজনে বিদ্যালয় স্থাপন করছে। বহু বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি বর্তমানে নিযন্ত্রিত রূপ পেয়েছে। সমাজ জীবনে জটিলতা বৃদ্ধির কারনে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিল মানুষ বুঝতে পারে যে, প্রশিক্ষণ ছাড়া ওই সমস্ত সমাস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ফলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বিদ্যালয় শিক্ষা বা প্রথাগত শিক্ষা। বর্তমান কালে প্রথাগত শিক্ষার বৈশিষ্ঠগুলি হল

১. নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী পরিকল্পিতঃ

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা পরিকল্পিত হয় নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে। দর্শন, মনোবিদ্যা, সামাজিক প্রত্যাশা ইত্যাদিকে ভিত্তি করে শিক্ষার লক্ষ্যকে স্থির করা হয়ে থাকে।

২. নির্দিষ্ট সূচী দ্বারা সীমাবদ্ধ ঃ

নিয়ান্ত্রিত বা প্রথাগত উপর ভিত্তি করে এই শিক্ষা প্রদান করা হয়। সুপরিকল্পিত নির্দেশনার মাধ্যমে এই ধরনের শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়।

৩. নির্দিষ্ট পাঠক্রম থাকে। ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই পাঠক্রম নির্ধারন করা হয়।

৪. শৃঙ্খলা ঃ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় উপযুক্ত শৃঙ্খলা দেখা যায়। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়কেই এই শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিলে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার কার্যক্রম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

৫. নির্দেষ্ট বয়সের শিক্ষার্থী ঃ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের বয়স আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা থাকে,শিক্ষার্থীদের ৩+ বছর বয়সে প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ৬+ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভরতি করা হয়।

৬. নির্দিষ্ট স্থান ঃ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী প্রত্যেককেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হতে হয়। শিক্ষার স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে হয়। শিক্ষাকরা ও সেইসব স্থানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের কাজ করেন।

৭. নিয়মিত উপস্থিতি ঃ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় ছুটির দিনগুলি ছাড়া প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষায় ছুটির শিক্ষালয়ে উপস্থিত হতে হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিক্ষালয়ে থাকতে হয়।

৮. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ঃ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক পরস্পর মুখোমুখি আলোচনায় অংশ নেয়। শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীকে পড়ান, শিক্ষার্থীবাও শিক্ষক কে প্রশ্ন করে এই সিথস্ক্রিয়ার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

৯. নিয়মিত পরীক্ষা ঃ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষর্থী পাঠ্য বিষয় গুলির উপর কত খানি জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছে তা জানার জন্য নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

১০. রাষ্ট্রে ভূমিকা ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় আর্থিক দায়দায়িত্ব এবং পরিচালনার ভার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনে

রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনে থাকে। দেশের শিক্ষা পরিকল্পনা, পাঠক্রম তৈরী,নীতি নির্ধারন, পরিচালনা ব্যবস্থা সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হয়।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য গুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই শিক্ষা সুপরিকল্পিত এবং পূর্ণনির্ধারিত। শিক্ষার পাঠক্রম, ভরতি, সময়সীমা, পরীক্ষাব্যবস্থা সবই নির্দিষ্ট। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই নির্দিষ্ট রীতিনীতি ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। উভয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় থাকে। সবশেষে বলা যায়, নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার একটি গরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এই শিক্ষা যোগ্য এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

নিয়ন্ত্রিত বা প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার সুবিধা ঃ-

প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি সবিধার কথা উল্লেখ করা হল।

১. পরবর্তী প্রজন্মকে সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে এবং সামাজিক উত্তরা ধিকারের অধিকারী করার লক্ষ্যে প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা সাহায্য করে।

২. প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সাধারণ পাঠক্রম এবং সহ- পাঠক্রমিক কার্যকলির সাহায্যে যে শিক্ষা সঞ্চালিত করা হয় তার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা একত্ব বোধ গড়ে ওঠে।

৩. সমাজে যোগ্য এবং প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।

৪. সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশের মধ্যে দিয়ে সামাজিক প্রগতি সম্ভব হয়।

৫. শিক্ষার সব উপাদান গুলি নিয়ন্ত্রি হওয়ায় পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাজ, দেশ এবং জাতির উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

প্রথাগত বা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সিমাবদ্ধতা বা ত্রুটি ঃ-

একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠোমোর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ সুবিধা থাকলেও এর সীমাবদ্ধতাও কম নয়। সেই সব সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি গুলি হল –

১. নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা মূলত শিক্ষক নির্ভর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে উপযুক্ত পড়ানোর কৌশলের উপর। কিন্তু দেশের অনেক নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্টানেই সে কাজে সক্ষম ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব দেখা যায়।

২. এই ব্যবস্থায় পাঠক্রম এবং অন্যান্য কার্যবলি পূর্ব নির্ধারিত হওয়ায় বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রম পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও পযুক্তির ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি ক্রমশ তীব্র হচ্ছে।

৩. এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত পুস্তককেন্দ্রিক, তাত্ত্বিক এবং কৃত্তিম। ব্যক্তি ও সমাজের বাস্তবতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়বস্তু হল বিদ্যালয়ের বিষয়বস্তু যা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন।

৪. নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পাঠক্রমে বৈচিত্রের অভাব লক্ষ্যনীয়। এই শিক্ষায় একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে ব্যাধ্যতামূলকভাবে একই বিষয়ে পড়াশোনা করতে হয়। ফলে নিজস্ব রুচি, চাহিদা, আগ্রহ এবং সামর্থ অনুযায়ী পাঠক্রম শিক্ষার্থীরা পায় না।

৫. নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা মূলত পরীক্ষা কেন্দ্রিক। পরীক্ষায় সফল হওয়া বা ভালো ফল করাটাই এখানে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। ফলে এই শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীরা নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ যথাযথভাবে ঘটে না।

৫.৫ অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ঃ Informal Education

সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের বাইরে কোন রকম পূর্ব নির্ধারিত রীতিনীতি ব্যতিত শিক্ষার্থীরা যে ধরণের শিক্ষা লাভ করে, তাকে অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বলে। এক্ষেত্রে শিক্ষার কোনো উপাদানই

পূর্ব-পরিকল্পিত নয়। বর্তমানে আমাদের জীবনব্যাপী শিক্ষার বড়ো অংশ ঘটে অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পরিবেশ। জীবনে চলার পথে সমাজ পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। এই অভিজ্ঞতা বা শিখন পূর্ব পরিকল্পিত নয়। একেই অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বলা হয়।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ক্ষেত্রে কুম্বের (Coomb) সংজ্ঞা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন– "Informal cducation is education which tapes place all the time informally or incidentally"। অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যা অবিরিত চলছে এবং যার উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রন নেই।

J.P. Maik আরো স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, সমাজে বাস করার ফলে ব্যক্তি যা শেখে তাই হল অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা। অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা গৃহে এবং সমাজের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এগুলি নিজেই এক ধরমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তবে প্রচলিত শিক্ষার মতো এইগুলি সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

অর্থাৎ, ১) যে শিক্ষা সব সময় চলছে, যার উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রন নেই তা অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।

২) প্রত্যক্ষ শিক্ষাপ্রচিষ্ঠান ছাড়া শিশু বা শিক্ষার্থী অন্যান্য মাধ্যম থেকে যে শিক্ষা অর্জন করে, তাই হল অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।

৩) পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে সার্থক ভাবে মানিয়ে নিতে গিয়ে এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরিবেশ থেকে কোন শিশু যে শিক্ষা, দক্ষা বা অভিজ্ঞতা অর্ঝন করে তা-ই অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ঃ

১) নিয়ন্ত্রনহীন শিক্ষা ঃ অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই শিক্ষায় কোন রকম প্রথাগত নিয়ন্ত্রন থাকে না। শিক্ষার প্রধান চারটি উপাদান, যথা – শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠক্রম এবং শিক্ষালয়ের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ শিক্ষার্থীৈই কেবল এই শিক্ষায় প্রাধান্য পায়। এবং বাকি তিনটি উপাদানের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

২) শিক্ষক নির্ভর নয় ঃ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় নির্দ্দিষ্ট কোন শিক্ষক নিযুক্ত থাকে না। শিক্ষার্থীর প্রকৃতি, পরিবার এবং সামাজিক সংস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহন করে। বর্তমানে গনশিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম যেমন – বেতার, চলচিত্র, দূরদশতন, সংবাদপত্র প্রভৃতি থেকে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই এই শিক্ষা গ্রহন করে।

৩) নির্দিষ্ট পাঠক্রমের অনুপস্থিতি ঃ অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কোন পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় না এবং কোন বিষয়ও (Subject) নির্দিষ্ঠ থাকে না।

৪) পূর্বপরিকল্পিত ও পূর্বনির্ধারিত নয় ঃ এই শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন কিছুই পূর্বপরিকল্পিত বা পূর্ব নির্ধারিত থাকে না। যেহেতু এখানে বিদ্যালয় থাকে না, পাঠক্রম থাকে না, কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না সেহেতু পূর্বপরিকল্পনার কোন সুযোগ এখানে নেই।

৫) চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ঃ এই ধরণের শিক্ষা বিদ্যালয় বা বড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শিক্ষার্থীরা যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময়ে এই শিক্ষা লাভ করতে পারে।

৬) পর্যবেক্ষন, অনুশীলন ও অনুকরণ নির্ভর শিক্ষা ঃ এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থী নিজ বাড়িতে বা বাইরে পরিবেশের কোন উপাদানকে পর্যবেক্ষন করে এবং তা অনুশীলনের মাধ্যমে নিজে নিজেই শেখে। ছোটরা বড়োদের অনুকরণ যা শেখে তাও অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।

৭) নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তর ও বয়স থাকে না ঃ অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় নির্দিষ্ট শ্রেণি বা শিক্ষাস্তর থাকে না এবং এবং এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য কোন নির্দিষ্ট বয়সসীমা নেই।

৮) কৃত্তিমতাহীন স্বাভাবিক শিক্ষা ঃ অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা সম্পূর্ণ কৃত্তিমতাহীন শিক্ষা। এখানে জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো হয় না। শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক উপায়ে বিভিন্ন উৎস বা মাধ্যম থেকে শিক্ষালাভ করে।

৯) নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক থাকে না ঃ এই ধরণের শিক্ষায় যেহেতু কোন পাঠক্রম নেই তাই এতে নির্দিষ্ট কো পাঠ্যপুস্তকও নেই।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থায় যেহেতু কোন পাঠক্রম নেই, নিয়মশৃঙ্খলা বা কোন পরিকল্পনা ব্যবস্থা নেই এবং কোন বিদ্যালয়ও নেই, তাই এতে মূল্যায়নের কোন সুযোগও নেই। শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ইচ্ছানুসারে শিক্ষালাভ করে। এটি এক সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাব্যবস্থা।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সীমাবদ্ধতা ঃ Limitations of Informal Education

শিশুর জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও এই শিক্ষা ত্রুটি যুক্ত নয়। এর কয়েকটি সীমাবদ্ধতা বা অসুবিধা উল্লেখ করা হল –

১) চাহিদা পূরণে অসামর্থ্য ঃ অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা শিক্ষার সব চাহিদা পূরণ করতে পারে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন অবিস্কারের ফলে জ্ঞানের জগৎ ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। বিভিন্ন জটিল এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয়ে পাঠদানের জন্য চাই অভিজ্ঞ শিক্ষক, উপযুক্ত শিক্ষালয় ও পরীক্ষাগার। অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় যেহেতু শিক্ষক, শিক্ষালয় ইত্যাদি থাকে না, তাই ত্রুটি মানুএষর ওইসব চাহিদা পূরণে অসমর্থ।

২) সৃজনমূলক বিকাশে সহায়ক নয় ঃ অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটার সুযোগ খুবই কম।

৩) সামাজিক পরিবর্তনের উপযোগী নয় ঃ এই ধরণের শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের খুব একটা উপযোগী হয় না।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্টের কোন নিয়ন্ত্রন না থাকায় সামাজিক বিকাশে এই শিক্ষা বিশেষ সাহায্য করতে পারে না।

৪) প্রকৃত মূল্যায়নের অভাব ঃ অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান অর্জন করে, সেই জ্ঞানের প্রকৃত মূল্যায়নের কোন ব্যবস্থা এই শিক্ষা পদ্ধতিতে নেই। সঠিক মূল্যায়ন ছাড়া কোন শিক্ষাব্যবস্থা সফল হয় না। অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি মারাত্বক ত্রুটি।

৫) বিশ্বাসযোগ্য তার অভাব ঃ অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় কোন প্রকার নিয়ন্ত্রন না থাকায় শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছানুযায়ী যা মন চায় তাই শেখে। মূল্যায়ণ নেই, পাঠক্রম নেই, শিক্ষক নেই, – তাই সমাজে এই জাতীয় শিক্ষার বিশ্বাস যোগ্যতা নেই বললেই চলে।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বর্তমান জটিল জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রুটিপূর্ণ হলেও মানুষের শিক্ষা শুরু হয় অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যমেই। আজও অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যমেই পরিবার শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর আগে বিভিন্ন বিষয়ের প্রাথমিক ধারণা দান করে, মোট কথা, আধুনিক জীবনের উপযোগী সব চাহিদা অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা থেকে পূরণ না হলেও মানব শিশুর বিকাশে গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

৫.৬ প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ঃ Non-formal Education

প্রথাগত শিক্ষার বাইরে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষায় মানব শিশু বা মানুষ জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যতদিন বাঁচে ততদিন শেখে। প্রথা বহির্ভুত শিক্ষার স্থান খোলা মাঠে, নদীর ঘাটে, রেঁস্তোরায়। এখানে ধরাবাঁধা কোন সময় তালিকা, বিদ্যালয় বসার নির্দিষ্ট সময় ও প্রথাগত পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা থাকে না। এখানে বয়স্করাও শেখে তাই বয়স্কদের শেখানোর পদ্ধতি মেনে শিক্ষাব্যবস্থা চলে।

বস্তুত নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বাইরে যে শিক্ষা-প্রক্রিয়া ও শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিচালনা করা হয় তাকেই বলা হয় নিয়ন্ত্রন বহির্ভুত শিক্ষা। এই নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার যে যে দিকে পৌঁছানো সম্ভব হয় না সেই সেই কর্মসূচী নিয়ে শিক্ষাকে পরিচালনা করার ব্যবস্থাকেই আজ নিয়ন্ত্রন- বহির্ভুত শিক্ষা বলা হচ্ছে। অনেকের মতে বিধিমুক্ত শিক্ষা বা প্রথাবহির্ভুত শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষার পরিপূরক। অনেকে একে প্রথাগত শিক্ষার বিকল্প বলে মনে করেন। কুম্বস ও আহমেদ (Coombs and Ahmed) প্রথাবহির্ভুত শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, প্রথাবহির্ভুত শিক্ষা হল বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা কাঠামোর বাইরে সংগঠিত এবং ধারাবাহিক শিখন প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য হল জনগন, প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের নির্দিষ্ট এক অংশের নিকট নির্বাচিত শিখন পরিস্থিতিতে উপস্থাপন করা। তারা আরো মনে করেন প্রথাবহির্ভুত শিক্ষা বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যেমন– কৃষি বিষয়ক কর্মসূচী,স্থানীয় অঞ্চলের উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত ও পেশাগত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এই সব কর্মসূচি যুবক, প্রাপ্তবয়স্ক যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তাদের উপকারে আসে। প্রথাবহির্ভুত শিক্ষা যেহেতু কোন সংগঠিত কর্মসূচী নয় সেজন্য এর জন্য কোন পরিকল্পনা প্রয়োজন নেই – এ ধারণা ভ্রান্ত।

এটা অবশ্যই সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষণের উপাদান সমূহ যেমন শিক্ষার্থীদের চাহিদা, আগ্রহ, সুবিধা এবং উপযোগিতা প্রভৃতি যথেষ্ট বিবেচনা করার পর পরিকল্পিত উপায়ে প্রথাবহির্ভুত শিক্ষা পরিচালিত হয়। এখানে শিক্ষার্থী কেবল বিষয় নির্বাচনেই সুযোগ পায় তা না, সময়, স্থান, দ্বায়িত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রেও পচ্ছন্দের সুযোগ আছে।

যে শিক্ষা বিদ্যালয়ে বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না হয়েও কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আংশিক নিয়ন্ত্রনে থাকে, তাকে বলে প্রথাবহির্ভুত শিক্ষা। প্রথাবহির্ভুত শিক্ষা হল প্রক্রিয়ার বাইরে সংহঠিত কোন শিক্ষার শিখন বা প্রশিক্ষণ যার ফলে শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতা বাড়ে, জীবন ব্যাপী শিখন সংগঠিত হয় এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটে।

প্রথাবহির্ভুত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ঃ

১) নমনীয়তা ঃ প্রথাগত শিক্ষার নমনীয়তা এবং স্বল্প ব্যায়ের জন্য পরিত্যাগের হার হ্রাস পায় এবং স্বল্প জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকার পক্ষেও উপযোগী।

২) ব্যবহারিকতা ঃ প্রথাবহির্ভুত শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রের ওপর পাঠদান বা কর্মসূচি গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে।

৩) প্রাসঙ্গিকতা ঃ প্রথাবহির্ভুত শিক্ষার কর্মসূচি প্রয়োজন ভিত্তিক এবং সকল বয়সের শিক্ষার্থীদের চাহিদার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়।

৪) নির্দিষ্ট শিক্ষালয় নেই ঃ প্রথাবহির্ভুত শিক্ষার পঠন-পাঠন চার দেওয়ালের ঘেরা কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হয় না। সাধারণত ডাক যোগে শিখন বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর বাড়িতে পাঠানো হয়। শিক্ষার্থী বাড়িতেই সেগুলির সাহায্যে পড়াশোনা করে।

৫) নির্দিষ্ট সময়সীমার অনুপস্থিতি ঃ প্রথাবহির্ভুত শিক্ষা সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকে না। শিক্ষার্থী রনিজের কাজের ফাঁকে যে কোন সময়ে পড়াশোনা করতে পারে। বাঁধাধরা নিয়মে প্রতিদিন কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে হয় না।

৬) মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মননীয় ঃ প্রথাবহির্ভুত শিক্ষায় মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রথাগত শিক্ষার মতো কঠোর নয়। একসঙ্গে সবপত্রের পরীক্ষায় না বসলেও চলে। যে ক'টি পত্রে শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি ভালো হয়েছে বলে মনে হয়, যে সেই ক'টি পত্রেই পরীক্ষায় বসতে পারে। ধীরে ধীরে সবকটি পত্রে পাস নম্বর পেলে সে এক সময়ে ওই কোর্সে উত্তীর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়।

৭) জীবনব্যাপী জ্ঞানলাভ ঃ প্রথাবহির্ভুত শিক্ষায় যেহেতু শিক্ষার্থীর বয়সজনীত কোন বাঁধা নেই শিক্ষার্থী তাই সারাজীবন ধরে পড়াশোনা করতে পারে এবং এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে সারাজীবন ধরে নতুন মতুন তথ্য ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়।

৮) সাহায্যকারী শিক্ষাব্যবস্থা ঃ প্রথাবহির্ভুত শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল কোন কারণে কোন শিক্ষার্থী প্রথাগত শিক্ষা গ্রহনে অপারাগ হলে, এই শিক্ষাপদ্ধতি তাদের শিক্ষাগ্রহনে সাহায্য করে।

৯) নির্দেশভিত্তিক শিক্ষা ঃ প্রথাবহির্ভুত শিক্ষার স্টাডি মেটিরিয়াল বিশেষভাবে প্রস্তুত করে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠানো হয়। শিক্ষার্থীরা সেই সব নির্দেশ অনুযায়ী পড়াশোনা করলে সঠিক পথে চালিত হতে পারে।

১০) কমখরচে শিক্ষা ঃ প্রথাগত শিক্ষার তুলনায় প্রথাবহির্ভুত শিক্ষার খরচ অনেক কম। এই শিক্ষার খরচ এমন ভাবে স্থির করা হয় যাতে দারিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরাও এতে অংশ নিতেপারে।

প্রথাবহির্ভুত শিক্ষার সুবিধা ঃ প্রথাবহির্ভুত শিক্ষার সুবিধা বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন –

১) শিক্ষালাভ ও অর্থ উপার্জন একই সঙ্গে চলতে পারে।

২) সারা জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ এই শিক্ষা সংগঠিত করতে পারে।

৩) শিক্ষা ব্যবস্থায় নমনীয়তা থাকার ফলে প্রথাগত শিক্ষার অসুবিধাগুলি দেখা যায় না। যার ফলে এই শিক্ষায় সকলেই আসতে পারে।

৪) এই ধরণের শিক্ষা পাঠক্রম, পদ্ধতি, শিখন মাধ্যম শিক্ষার্থীদের নিকট অধিক অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

৫) প্রথাগত শিক্ষা থেকে যারা বঞ্চিত এমন লক্ষ লক্ষ শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের নিকট শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে পারে।

৬) এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং স্বয়মসেবী সংস্থাকে ব্যবহার করা যায়, যার ফলে শিক্ষা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

৭) শিক্ষাকে গনতন্ত্রীকরণের একটি কার্যকরী উপায়।

প্রথাবহির্ভুত শিক্ষার সীমাবদ্ধাতা ঃ

শিক্ষার সর্বাঙ্গীন প্রসারে এবং শিক্ষার গনতন্ত্রীকরণের দিক থেকে প্রথাবহির্ভুত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না ঠিকই, তবে এই শিক্ষা ব্যবস্থাতেও বিভিন্ন ধরণের ক্রুটি লক্ষ্য করা যায়। ক্রুটিগুলি হল–

১) প্রথাবহির্ভুত শিক্ষা শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক প্রভৃতি সবকটি চাহিদা পূরণ করতে পারে না।

২) প্রথাবহির্ভুত শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে নিয়মিত শ্রেণিশিক্ষণে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় না। ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বোধ গড়ে ওঠে না।

৩) প্রথাবহির্ভুত শিক্ষায় একভাবে কোন সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে না। শিক্ষার্থীরা যেহেতু দলগত ভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না, তাই শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

৪) অনেক ক্ষেত্রেই প্রথাবহির্ভুত শিক্ষার দ্বারা অর্জিত প্রশংসাপত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

৫) শিক্ষার্থীর মধ্যে উপযুক্ত পরিমানে প্রেষণার সঞ্চার না ঘটলে এই ব্যবস্থায় প্রত্যাশা অনুযায়ী সফলতা আসে না।

৬) এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয় না।

৭) প্রশাসনিক শৃঙ্খলার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার বানিজ্যিকরণের ঘটে এবং এটি প্রথাগত শিক্ষার বিকল্প নয়।

প্রথাবহির্ভুত শিক্ষার বেশ কিছু অসুবিধা থাকলেও ভারতের মতো জনবহুল দেশে যেখানে প্রথাগত শিক্ষা সব মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে না, সেখানে এই শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষভাবে কার্যকরী। তাছাড়া দরিদ্র জনগনের কাছে স্বল্পব্যায়ের এই শিক্ষা আশীর্বাদ স্বরূপ। শুধু তাই নয়,স্কুলছুট শিক্ষার্থী, ও চাকুরীজীবি মানুষের কাছে প্রথাবহির্ভুত শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

৫.৭ জীবনব্যাপী শিক্ষা ঃ Life long Education

একজন বক্তি বছরের, মাসের ও দিনের প্রতিটি মুহূর্তে কিছু না কিছু শেখে অনুভব করে, ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং সুযোগ সুবিধা মত বিভিন্ন ধরণের জ্ঞান অভিজ্ঞতা অর্জন করে। আজকের পৃথিবীতে কেউই বলতে পারে না আগামীকাল কী ঘটবে এবং কাল তাদের কাছে কেন্ নতুন ঘটনা উপস্থিত হবে।

এই প্রেক্ষিতেই একজন মানুষকে নানা দিক থেকে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী হয়ে উঠতে হয় তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তাকে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হতে হয়।

এজন্য ‘Life long Education’ বলতে বাস্তবে ‘Education all of life’ কে বুঝিয়ে থাকে থাকে। জীবনের কোন দিকের জ্ঞান, প্রশিক্ষণকেই এই অর্থে বাদ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। UNESCO এর পঞ্চদশতম সাধারণ সভায় ‘Life long Education’ এর মূল ধারণার পরিধির মধ্যে সমস্ত স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাকে, সকল প্রকার বিদ্যালয় বহির্ভুত শিক্ষাকে এবং কৃষ্টিগত বিকাশের সকল নীতি-নির্ধারণকে অন্তভুক্ত করা হয়েছে। এখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় পাশকেই উদ্দেশ্য হিসাবে না বিবেচিত করে ‘The capacity of each pupil to learn and grow’-কেই অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়। এই শিক্ষার সকল স্তরে তাই স্বশিক্ষাকে এবং সকল রকম শিক্ষার মাধ্যমকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা একটি জীবনব্যপী প্রক্রিয়া। জ্যাক ডেলরের নেতৃত্বে ইউনেস্কো কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা হল জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে গেলে শিক্ষাকে নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। শিক্ষার ব্যাপ্তি হবে সমগ্র জীবন – জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

জীবনব্যাপী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ঃ

১) শিক্ষার সময়কাল নির্দিষ্ট হবে না।

২) নির্দিষ্ট এবং বাঁধাধরা কোন পাঠক্রম থাকবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঠক্রম থাকলেও তা যথেষ্ট হবে নমনীয় হবে।

৩) ব্যক্তি তার ইচ্ছা, সামর্থ্য এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শিখতে পারবে।

৪) মূল্যায়ন থাকলেও তা যথেষ্ট নমনীয় হবে।

৫) জ্যাক ও ডেলরের নেতৃত্বে আন্তজার্তিক স্তরে যে আলোচনা হয়, সেখানে চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলি হল –

১) জানার জন্য শিক্ষা (Learning to kmow)।

২) কর্মদক্ষতার জন্য শিক্ষা (Learning to do)।

৩) একত্রে বাঁচার শিক্ষা (Learning to live together)।

৪) প্রকৃত মানুষের জন্য শিক্ষা (Learning to be)।

জীবনব্যাপী শিক্ষার একাধিক কৌশল বা উপায়গুলির অন্যতম হল দূরশিক্ষা এবং মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা।

৫.৮ বয়স্ক শিক্ষা ঃ Adult Education

বয়স্ক বলতে ১৪-৪৫ বছরের বয়স্ক মানুষকে বোঝায়। ভারতের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ বয়স্ক অথচ নিরক্ষর। এই মানুষদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা জাতীয় কর্তব্য। শিশুদের বিশেষত ৬-১৪ বছর বয়স্কদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে সেরকম রক্ষাকবচ না থাকলেও গনতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে এই মানুষদের শিক্ষার উপর। জাতীয় উন্নয়নের সাথে এই শিক্ষার প্রসার ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও এই শিক্ষা সামাজিক শিক্ষার অংশ হিসাবে প্রকাশ পায়, আবর কখনও এই শিক্ষা কার্যকরী সাক্ষরতা রূপে ব্যবহার করা হয়। কার্যকারী সাক্ষরতা বলতে এমন এক শিক্ষা বোঝায় যা মানুষকে সামাজিক ও বৃত্তিগত জীবনে কাজ করতে সাহায্য করে। বয়স্ক শিক্ষা বলতে শিক্ষার মাধ্যমে বৃত্তি, কারিগরী ও পেশাগত দক্ষতা অর্জন ছাড়াও ব্যক্তি-মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত উন্নয়নে সহায়ক হয়।

বয়স্ক শিক্ষা দুই প্রকৃতির – বয়স্ক সাক্ষরতা ওবং প্রবহমান শিক্ষা। বয়স্ক সাক্ষরতা হল যেসব বয়স্ক ব্যক্তি আগে কোন দিন বিদ্যালয়ে যায়নি তাঁদের শিক্ষা এবং প্রবাহমান শিক্ষা হল সেই ধরণের বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষা যাঁরা কোন না কোন সময়ে কিছু সময়ের জন্য হলেও বিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জন করেছেন।

বয়স্ক শিক্ষা Earnest Barter এর মতে, আংশিক সময়ের ভিত্তিতে বয়স্ক শিক্ষা দেওয়া যায়। এই জন্য বয়স্ক শিক্ষা কাজ ও জীবিকা অর্জনের সঙ্গে যুক্ত। বয়স্ক শিক্ষা, বয়স্ক সাক্ষরতা, কার্যকরী সাক্ষরতা, সামাজিক শিক্ষা সব কিছুই বয়স্ক শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

১) বিশ্বের বৃহত্তম গনতান্ত্রিক দেশ হল ভারতবর্ষ। এই গনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে দেশের সচেতন নাগরিকদের উপর। সুতরাং দেশের মানুষকে যদি শিক্ষিত করা না যায় তাহলে গনতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়ে। শেই কারণে দেশে গনতন্ত্রের বুনিয়াদ শক্তিশালী করতে হলে নিরক্ষর মানুষদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

২) শিক্ষা মানুষের জীবিকা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। বৃত্তিমুখী শিক্ষার দ্বারা মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে।

৩) দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করতে হলে দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র মূলত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

৪) অবসর সময়কে অর্থবহ করবার জন্য শিক্ষা প্রয়োজন। সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তুলতে অবসর সময়কে কাজে লাগানো যেতে পারে।

৫) বয়স্ক শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা, সামাজিক সম্পর্কের উন্নতি, জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করা, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায়নীতির প্রসার, জাতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে।

বয়স্ক শিক্ষার ধীর অগ্রগতির কারণ ঃ

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্ঠায় বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা নেওয়া গ্রহন করা হলেও সামগ্রিক ভাবে খুব একটা উন্নতি হয়নি। এর কারণগুলি হল –

১) বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে শ্রেণিকক্ষ, পাঠাগার ও উপযুক্ত বইয়ের যথেষ্ট অভাব দেখা যায়।

২) উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে একটি প্রধান কারণ। বয়স্ক শিক্ষার সঙ্গে যারা যুক্ত, বয়স্কদের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে তাদের সঠিক ধারণা নেই, বয়স্কদের পড়াবার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁদের সঠিক প্রশিক্ষণ নেই।

৩) বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর বয়স্কদের কার্যকরী সাক্ষরতা দান করার জন্য শিক্ষিত মানুষদের উদ্‌বুদ্ধ করা যায়নি।

৪) গণমাধ্যমগুলি বয়স্ক শিক্ষঅ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রচার করে না।

৫) ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত ৬-১৪ বছর বয়স্কদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায়নি। সেই কারণে প্রতি বছরই স্কুলছুট (Drop out) পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

৬) বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচি স্বার্থক করে তোলার জন্য যথাযোগ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব।

৭) বয়স্ক পড়ুয়াদের মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার করা হয় না।

৮) পাঠদানের সময়, শিক্ষাকাল, স্থান সব কিছুই খুব অনমনীয় – যা অনেক বয়স্কদের মধ্যেই শিক্ষার প্রতি অনিহা ঘটায়।

৯) বয়স্ক শিক্ষা পরিকল্পনাগুলিও বাস্তবসম্মত নয়। প্রকল্পগুলির মধ্যেও মৌলিক দুর্বলতা রয়েএছ। সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সবাই বয়স্ক শিক্ষার বিষয়ে উদাসহীন।

১০) সমীক্ষায় দেখা যায়, দারিদ্রতাই সাক্ষরতার প্রধান বাঁধা। দরিদ্র মানুষ সারাদিন পরিশ্রমের পর নৈশ বিদ্যালয়গুলিতে আসার আগ্রহ দেখা যায় না। ব্যক্তিগত আমদ-প্রমোদেই তারা সময় কাটাতে আগ্রহী।

উপরিউক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।

১) প্রারম্ভিক শিক্ষা অর্থাৎ ৬-১৪ বছর অবধি সর্বজনীন আবশ্যক শিক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।

২) উপযুক্ত বেতনদান করে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৩) প্রতিটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, তা বাবসায়িক হোক বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান হোক, চেষ্টা করবে তাদের নিরক্ষর কর্মাদের কার্যকরী সাক্ষর করে তুলতে।

৪) সব বয়স্ক সাক্ষরতা প্রকল্পই সুপরিকল্পনা এবং উপযুক্ত প্রস্তুতির মাধ্যমে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে হবে।

৫) সরকারী, বেসরকারী, সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে সাক্ষর হওয়ার প্রয়োজন বোঝাবার জন্য।

৬) পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের জন্য ভিন্ন পাঠক্রম চালু করতে হবে।

৫.৯ দূরাগত শিক্ষা ঃ Distance Education

দূরাগত শিক্ষা হল সনাতন নয় এমন নতুন ধরণের শিক্ষা যাতে সমস্ত রকম যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করা হয়। ভারতীয় সংবিধানে সবার শিক্ষার সমসুযোগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার উৎস সীমিত হওয়ার জন্য বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান সম্ভব হচ্ছে না। এর পরিপূরক হিসাবে আধুনিক দূরাগত শিক্ষার আবির্ভাব যেখানে শিক্ষার সময়, পড়ার বিষয়, শিক্ষার্থীর বয়স, শিক্ষক সমস্যা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতাগুলিকে দূরকরা সম্ভব হয়েছে।

প্রথাবহির্ভুত শিক্ষার ক্ষেত্রে দূরাগত শিক্ষা হল এক বিশেষ ধরেণর শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থাটি মূলত তিনটি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। যথা – ১) করেসপন্ডেন্স শিক্ষা ২) মুক্ত শিক্ষা এবং দূরশিখন বা ডিসট্যান্স লার্নিং।

দূরাগত শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি নিয়ন্ত্রন বহির্ভুত শিক্ষা মাধ্যম যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বাঁধাধরা সময়, সুযোগ, শিক্ষা ব্যায়ের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে পারে এবং নিজেদের সামর্থ, বাসস্থানের অবস্থা নিরপেক্ষ শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ পেতে পারে।

অর্থাৎ যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে এবং শিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছাড়াই ডাকযোগে বা অন্য কোন মাধ্যমের সহায়তায় শিক্ষালাভ করে, তাকে দূরাগত শিক্ষা বলে।

ডেভিড বাটস্– এর মতে দূরাগত শিক্ষা হল সেই ধরণের শিক্ষা যাতে শিক্ষার্থীদের নিজস্বতা বজায় রাখার সুযোগ থাকে এবং শিক্ষন পদ্ধতির নমনীয় তার ফলে তাদের ইচ্ছা ও সময় সুযোগ পঠন পাঠনের মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষিত করে।

দূরশিক্ষার বিশেষজ্ঞ desmond Keegam বলেছেন, “Distance Education represents distance teaching with learning” অর্থাৎ দূরশিক্ষা হল দূরশিক্ষন এবং শিখন। Peters এর মতে, দূরশিক্ষা হল পরোক্ষ নির্দেশদান, কারণ এক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে না। এখানে উচ্চমাত্রায় প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়, যার ফলে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিক্ষাগ্রহন করতে সক্ষম হয়।

দূরশিক্ষার বৈশিষ্ট্য ঃ

দূরশিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি হল–

১) দূরশিক্ষা প্রাথমিক ভাবে একটি সুশিখন পদ্ধতি।

২) প্রযুক্তি ভিত্তিক মাধ্যম যেমন – মুদ্রন, অজিয়ো, ভিডিয়ো বা কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংগোগ ঘটানো হয় এবং শিখনের বিষয় বিনিয়োগ হয়।

৩) দূরশিক্ষা সাধারণ ও প্রথাগত শিক্ষার একটি বিকল্প ব্যবস্থা।

৪) শিক্ষার্থীরা এখানে নিজের দক্ষতা অনুযায়ী উন্নতি করে।

৫) এটি অপেক্ষাকৃত উদ্ধাবনীমূলক, নমনীয় এবং স্বল্প ব্যায়ে সম্ভব।

৬) সাধারণ শিক্ষকের মতো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই এই শিক্ষা দেওয়া হয়।

৭) সাধারণ শিক্ষণের মতো দূরশিক্ষারও নিজস্ব পাঠক্রম, মূল্যায়ন ব্যবস্থা ইত্যাদির বিধি চালু আছে।

৮) বয়স্ক চাকুরীজীবিদের জীবনব্যাপী শিক্ষা ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে এবং জ্ঞানের বিকাশের সাথে পা ফেলে চলতে সক্ষম করে।

৯) বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী বিভিন্ন ধরেণের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

১০) বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার স্বার্থে এবং সকলের জন্য শিক্ষার (Education for all) বাস্তবায়নে কার্যকরী হয়ে ওঠে।

দূরাগত শিক্ষার সুবিধা ঃ

প্রথাগত শিক্ষার সীমাবদ্ধতার কারণে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে দূরাগত শিক্ষার উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবে এই শিক্ষার বিশেষ কয়েকটি সুবিধা আছে যা নিচে উল্লেখ করা হল –

১) দূরাগত শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই শিক্ষার সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত।

২) কম খরচে সহজ সরল পদ্ধতিতে এই শিক্ষা দান করা হয়।

৩) বিদ্যালয় গৃহ, শ্রেণিকক্ষ, ছাত্রাবাস ইত্যাদির প্রয়োজন নেই।

৪) চাকুররীর তারা কাজ না ছেড়েও পড়তে পারে।

৫) সারাজীবন ধরে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়।

৬) শিক্ষক সসংদ, শিক্ষার্থী সংসদ, বনধ বা ধর্মঘটের কোন সুযোগ থাকে না।

৭) দূরাগত শিক্ষা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যারা প্রথাগত শিক্ষায় অংশ নিতে পারে না, তারা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের মানব সম্পদ বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ নেয়।

৮) কোন একটি কোর্সে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে।

৯) দূরশিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের একসঙ্গে দিনের পর দিন কোন শিক্ষালয়ে উপস্থিত হয় না। ফলে বিশৃঙ্খলাহীন শিক্ষা দেখা যায়।

১০) দূরশিক্ষায় কনট্যাক্ট পোগ্রামে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকের সান্নিধ্য পায়।

১১) দূরশিক্ষা সমাজের সর্বস্তরের মানুযে কাছে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করে।

১২) দূরশিক্ষা জাতীয় সংহতি বিকাশে সহায়তা করে।

৫.১০ শিক্ষার সংস্থা হিসেবে বিদ্যালয় ঃ School as an agency of Education

শিক্ষার প্রত্যক্ষ মাধ্যম হল বিদ্যালয়। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে পরিবারের পক্ষে শিক্ষার গুরুদায়িত্ব এককভাবে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষার প্রত্যক্ষ দায়িত্বশীল সংস্থা হিসাবে শিক্ষামূলক গুরুদায়িত্ব বহন করতেই বিদ্যালয়ের আবির্ভাব।

শিক্ষালয়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘School’ থেকে যার অর্থ হল ‘অবসর সময়ে তত্ত্বমূলক আলোচনার স্থান বা বৈঠক। বস্তুত গ্রীকরা আগুন পোহানোর সময় যে আলোচনার বৈঠক বসাত তাকেই বিদ্যালয়ের আদি সূত্র বলা যায়।

বর্তমানে বিদ্যালয় বা স্কুল হচ্ছে এমন একটি আসবাব পত্র ও সরঞ্জাম যুক্তগৃহে যেখানে শিক্ষার্থরা নির্দিষ্ট পাঠক্রম ানুসারে শিক্ষকদের নিকট হতে উপযুক্ত পদ্ধতি প্রনালী ভিত্তিক শিক্ষা গ্রহন করে থাকেন।

শিক্ষার প্রত্যক্ষ স্থান হিসাবে বিদ্যালয় গড়ে ওঠে অভিভাবকদের প্রয়োজনে। তাছাড়া এখানে নির্দিষ্ট পরিচালন কতৃপক্ষ, নির্দিষ্ট শিক্ষাকর্মী, শিক্ষকমন্ডলী আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম থাকে এবং শ্রেণিভিত্তিক পাঠমালা সহযোগে পঠন পাঠন প্রক্রিয়া চলে।

বিজ্ঞানের উন্নতি, শিল্পবিপ্লব ও গনতন্ত্রের প্রসারের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ‘স্কুলের’ প্রকৃতি ও পাঠক্রমের পরিবর্তন শুরু। বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ, জনসাধরণের মধ্যে প্রসারিত হয়। আর এই সম্প্রসারণের দায়িত্ব ধীরে ধীরে সরকারের ওপর বর্তায়। যুগ পরিবর্তনে সমাজের চাহিদায়, বিদ্যালয় পঠক্রমে বিজ্ঞান ও বৃত্তি শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি ঘটে। আধুনিক উন্নত গনতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকের পূর্ণ বিকাশের জন্য মানবিক ও কৃষ্টিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা আজ বিশ্বের সকল শিক্ষাদার্শনিক স্বীকার করে তা বিদ্যালয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন।

সমাজকে বাদ দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো মাধ্যমেই অস্তিত্ব সম্ভব নয়। শিক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয়সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। এই প্রতিষ্ঠান যে সমাজে যত সুবিন্যাস্ত, সেখানে শিক্ষা তত কার্যকরী। সামাজিক জীবনযাপন মানুষের শিক্ষা লাভের প্রভৃত মাধ্যম। তাই আধুনিক প্রতিটি অগ্রসর দেশেই সমাজ ও শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে। বিদ্যালয়কে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম সংস্করণ হিসাবে গড়ে তোলায় সবার লক্ষ্য। বিংশ শতাব্দির প্রখ্যাত দার্শনিক জন ডিউই এর কথায় – “School is a simplified purified and belln balanced society”.

বিদ্যালয় শিক্ষা আজ আর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র সমাজের স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন। তাই বিদ্যালয় আজ আদর্শ সমাজের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কেবমলমাত্র বিদ্যালয় নয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ শিক্ষা মাধ্যমকেই শিক্ষালয় বলে।

শিক্ষালয়ের দ্বায়িত্ব এবং কার্যাবলী ঃ Responsibilities and Functions of School

মানব সমাজের বিকাশের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানব সমাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পেছনে দুটি নীতি সবসময় ক্রীয়াশীল – (১) মানুষের অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ও (২) অতীত সংস্কারের সঞ্চালন। এই দুটি নীতির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষালয়ের দ্বায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

১) অতীত ঐতিহ্যের সংরক্ষণ (Preserution of Cultural heritage) ঃ সমাজে বয়স্ক ব্যক্তিরা পূর্বপুরুষদের থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা সংস্কার করা বিদ্যালয়ের কাজ। শিক্ষার্থীকে সার্থক উত্তরসূরি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন অতীত সংস্কারের সংরক্ষণ। কারণ এই কৃষ্টিই হল আমাদের সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। বিদ্যালয়ে এই সংরক্ষন বিভিন্নভাবে হতে পারে, যেমন-পুঁথির মাধ্যমে, শিক্ষকদের কাজের মাধ্যমে, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, আধুনিক প্রযুক্তিতে কম্পিউটারের মাধ্যমে হতে পারে।

২) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঞ্চালন (Transristation of cultrual Heritage) ঃ সামাজিক কৃষ্টি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সঞ্চালিত করার দ্বায়িত্ব বিদ্যালয়ের। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে অনুশীলনের দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অতীত সংস্কার সঞ্চালন করা যায়।

৩) সামাজিক কৃষ্টির উন্নয়ন ঃ সমাজের কৃষ্টি সংরক্ষণ ও সঞ্চালন ছাড়াও পুরাতন কৃষ্টির সংস্কার করে এবং কৃষ্টি সৃষ্টি করে সমাজের অগ্রগতিতে সাহায্য করা বিদ্যালয়ের কাজ।

৪) সংশোধনী দায়িত্ব ঃ অনেক সময় শিশু তার গৃহ বা সমাজ পরিবেশ থেকে এমন কিছু আচরণ আয়ও করে যা সমাজ স্বীকৃত নয়। বিদ্যালয়কে ওই আচরণগুলি সংশোধনের দ্বায়িত্ব নিতে হয়।

৫) সৃজনমূলক কাজের বিকাশ ঃ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সৃজনাত্মক প্রতিভার বিকাশের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি করে সমাজের অগ্রগতিতে সাহায্য করে।

৬) সমাজিকীকরণ ঃ সমাজের নিয়ম-নীতি, আচরণ, প্রথা ও মূল্যবোধের সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করা বিদ্যালয়ের একটি কাজ।

৭) জীবনদর্শন গঠন ঃ বিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীর প্রগতিশীল জীবনদর্শন গড়ে তোলার কাজ করতে হয়।

৮) বৌদ্ধিক বিকাশ ঃ শিশুর বৈদ্ধিক বিকাশের জন্য জ্ঞানমূলক শিক্ষাদানের কাজ বিদ্যালয়কে করতে হয়।

৯) মূল্যায়ন ঃ বিদ্যালয়ের একটি কাজ হল শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের মূল্যায়ণ করা এবং তার রেকর্ড (Cumulatine Record Card) তৈরি করা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে সাফল্য জানা যায়।

১০) ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বিকাশ ঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের নীতির উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করা এবং নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। এতে শিক্ষার্থীর জীবনে সহায়তা করা এবং নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন।

৫.১১ শিক্ষার সংস্থা হিসাবে গৃহ ঃ

পরিবার বা গৃহ হল সমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীকালে অন্যান্য সমাজ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে এই পরিবার থেকে। Bellard এই মতকে সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, “Home or family is the original social institution, from which all other institutions developed” এই গৃহে পরিবেশ শিশুর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা।

শৈশবের শিক্ষা মানুষ গৃহ থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে পেয়ে থাকে। গৃহের পরিবেশে শিশু বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে এবং সামাজ জীবনের রীতিনীতি, আচরণ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে পরিচিতি হয়। শিশুর সুষম বিকাশের দায়িত্ব থাকে পরিবারের উপর। শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন রকম সামাজিক গুনগৃহের মধ্যেই বিকশিত হয়। শিশুর নৈতিকএবং সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে গৃহের দভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

গৃহ হল এমন সংস্থা যেখানে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দুটি ব্যত্তিত্বের পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্পর্ক খুব সহজ ও স্বাভাবিক। শিশু পিতামাতার সঙ্গে থাকতে থাকতে জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সহজে শিখতে পারে। বর্তমানে প্রথাগত শিক্ষা গৃহ বা পরিবারের এই ভূমিকার প্রতি যথেষ্ট আস্থা রাখে।

শৈশব হল অভ্যাস গঠনের সময়। এই বয়সে শিশুর মন অনেক নমনীয় থাকে। তাই অনেক কিছুই তাকে শেখানো যায়। তাই গৃহ হল শিক্ষা অর্জনের আদর্শ স্থান।

বস্তুত গৃহের স্নেহময় পরিবেশ প্রত্যেক শিশুর জীবনে এক সুস্নিগ্ধ আবহাওয়া সৃষ্টি করে তার জীবনে নিরাপত্তাবোধ জাগিয়ে তোলে। একমাত্র গৃহ বা পরিবারই প্রত্যেক শিশুর জীবন বিকাশের চাহিদাগুলো যোগ্যতার সঙ্গে মিটিয়ে শিশুর জীবন ধারাকে প্রাণময় ও জীবন্ত করে তুলতে পারে।

কোমোনিয়াসের মতে – ‘‘শিশুর প্রথম স্কুল হল মায়ের কোল”। শৈশবে শিশুর বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা অর্জন নির্ভর করে তার মায়ের উপর। হার্বার্ট শিশু শিক্ষায় মায়ের ভূমিকা সম্বন্ধে বলেছেল ‘‘ একজন আদর্শ মা একশো জন স্কুল শিক্ষকের সমান”।

শিশুর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক চাহিদাগুলি গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধিকরতে হবে এবং এই চাহিদাগুলি তৃপ্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এই চাহিদাগুলি তৃপ্ত না হলে শিশুর মধ্যে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। শিশুর চাহিদাগুলি হল–

দৈহিক চাহিদা ঃ সুষম পুষ্টিকর খাদ্য, প্রয়োজনীয় রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা।

মানসিক চাহিদা ঃ নিরাপত্তা, স্নেহ ভালবাসা, আদর যত্ন ইত্যাদি।

সামাজিক চাহিদা ঃ সামাজিক রীতি নীতি, আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদি।

শিশুর কল্যাণময় জীবনের প্রস্তুতি দায়িত্ব পিতামাতাকে নিতে হয়। এবং সে কারণে শিশুর আগ্রহ, ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে তাকে পথ চলার নির্দেশ দিতে হয়। শৈশবে পিতামাতার সান্নিধ্যে শিশুর যে শিক্ষা শুরু হয় তাই হলতার সার্থক জীবনের ভিত্তি। শিশুর জীবন যাপনের শিক্ষা নির্ভর করে শিশু ও পিতামাতার মধুর সম্পর্কের ওপর।

৫.১২ শিক্ষায় গণ মাধ্যম ঃ (Mass Media in Education) :

যে মাধ্যমগুলির দ্বারা একসঙ্গে অনেক ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগস্থাপন করা যায় এবং সময় ও স্থানের ব্যবধানকে অতিক্রম করা যায় তাকেই গণমাধ্যম বলা হয়। গণমাধ্যম হল শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যম। এগুলির

দ্বারা সমাজের মানুষকে শিক্ষিত করা যায় এবং গণচেতনা সৃষ্টিতে এগুলি সাহায্য করে। এগুলির সাহায্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক তথ্য পরিবেশন করা হয়। অনেক শিক্ষাবিদ এগুলিকে শিক্ষার অবসরকালীন মাধ্যম বলে অভিহিত করেছেন কারণ অবসর সময়ে ব্যক্তি আনন্দের সঙ্গে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। বর্তমানে এই মাধ্যমগুলি অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থাতেও সাহায্য করে। গণমাধ্যমগুলি হল – সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন।

শিক্ষায় গণ মাধ্যমের শিক্ষাগত তাৎপর্য ঃ–

শিক্ষার বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলি হল – সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি। এই মাধ্যমগুলি প্রথাগত শিক্ষা এবং প্রথাবর্হির্ভূত শিক্ষায় বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। এগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে নিজের প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষা অর্জন করতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলির শিক্ষাগত বিষয় আলোচনা করা হল ঃ

সংবাদপত্র ঃ সংবাদপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে, যেমন –

১) সংবাদপত্র শিক্ষার্থীদের চিন্তাধারা, আচরণ, নৈতিক ও সামাজিক জ্ঞানকে উন্নত করতে সাহায্য করে।

২) শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলে।

৩) সংবাদপত্রের বিভিন্ন তথ্য থেকে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহান্বিত হয়।

৪) সংবাদপত্র শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষায় সাহায্য করে।

৫) শিক্ষার্থীরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় যেমন – বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানতে পারে।

৬) দৈনন্দিন ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হতে পারে।

বেতার ঃ বেতার একটি গণশিক্ষার শ্রুতি মাধ্যম। বেতার বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার সহায়তা করে, যেমন –

১) বেতারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন জ্ঞান অর্জন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

২) 'বিদ্যার্থীদের জন্য' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারে। এই অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা পাঠের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকেন তার ফলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়।

৩) 'সংগীত শিক্ষার' আসরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সংগীত শিক্ষালাভ করতে পারে।

৪) বেতার নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত ব্যক্তির কাছে সংবাদপত্রের চেয়ে বেশি গ্রহণীয়।

৫) 'পল্লীমঙ্গল আসর'– এর দ্বারা কৃষি, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং এর দ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়।

৬) সংগীত, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির চিত্তবিনোদন হয় এবং অবসর সময় আনন্দের সঙ্গে কাটাতে পারেন।

৭) ‘মহিলা মহল’- এর মাধ্যমে মহিলারা গৃহকর্ম, খাদ্য, শিশু পালন ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারে।

৮) বেতার যেহেতু শ্রুতিনির্ভর অনুষ্ঠান প্রচার করে, তাই দৃষ্টিহীনরা এই অনুষ্ঠান থেকে বিশেষ উপকৃত হয়।

দূরদর্শন ঃ দূরদর্শন একটি শ্রুতি দৃশ্য গণমাধ্যম। দূরদর্শনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। যেমন –

১) সমাজে ঘটমান দৃশ্যের ছবি সঙ্গে সঙ্গে সবাই দেখতে পারে, তার ফলে ব্যক্তি বিষয়টি সম্বন্ধে এবং ঘটনা সম্বন্ধে সঠিত তথ্য জানতে পারে।

২) দূরদর্শনের কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত বিনোদন হয়ে থাকে।

৩) যেহেতু এটি শ্রুতি দৃশ্যমান মাধ্যম তার ফলে দূরদর্শনের অনুষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীর মনে স্থায়ী ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

৪) বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়গুলি অভিজ্ঞ শিক্ষকের দ্বারা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্প্রচার করার ফলে শহর ও গ্রামের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়।

৫) এর আবেদন সর্বত্র – ধনী, নির্ধন, উচ্চ-নীচ, স্বাক্ষর, নিরক্ষর সবার কাছেই।

৬) খেলাধূলা ইত্যাদিকে উৎসাহ দেওয়া ও দেশীয় শিল্পকলা ও সামাজিক- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্য উপলব্ধি করা।

৭) শ্রেণিকক্ষের পরিপূরক মাধ্যম রূপে অগ্রগণ্য।

চলচ্চিত্র ঃ চলচ্চিত্র একটি শ্রুতি দৃশ্য গণমাধ্যম। এর মাধ্যমে –

১) শিক্ষার্থীরা সহজে আকৃষ্ট হয়।

২) ব্যক্তি চিত্তবিনোদন হয়।

৩) শিক্ষার্থীর মনে স্থায়ী ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

৪) চলচ্চিত্র মাধ্যমে মানবজীবনের বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন দেশের ভৌগলিক পরিবেশ, ইতিহাসের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখা যায় এবং সে বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়।

৫) শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে।

৬) ছাত্রদের মধ্যে আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে ওঠে।

৭) দেশ-বিদেশের নানা চিত্র দেখার ফলে বিশ্বায়নের আদর্শ পূর্ণ হয়ে ওঠে।

৮) বিভিন্ন কাহিনিকার, চলচ্চিত্র শিল্পী, নায়ক-নায়িকা আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন। আজ বৃত্তিশিক্ষার যুগে চলচ্চিত্র শিল্প শিক্ষা, অভিনয় শিক্ষা ইত্যাদি অত্যন্ত উপযোগী।

৯) জীবনব্যাপী শিক্ষাপ্রক্রিয়ার মাধ্যম হিসাবে দূরদর্শন একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

১.১৩ সংক্ষিপ্তসার (Summing up) :

ব্যক্তির জীবনকে সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য এবং সমাজ জীবনের রীতিনীতি, অভিজ্ঞতা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্য সমাজে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক প্রতিষ্ঠান হয়েছে। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যেগুলি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সার্বিক উন্নয়ণে সাহায্য করে এবং সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কারকে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত করার দায়িত্ব পালন করে, তাদের বলা হয় শিক্ষার সংস্থা।

শিক্ষার সুস্পষ্ট তিন ধরণের মাধ্যমসমূহ হচ্ছে বিধিবদ্ধ মাধ্যম (Formal Agency), আধিকারিক মাধ্যম (Informal Agency) এবং বিধি বর্হির্ভূত মাধ্যম (Non formal Agency)। শিক্ষার এক ও অদ্বিতীয় বিধিবদ্ধ মাধ্যম হচ্ছে বিদ্যালয় বা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অবিধিবদ্ধ শিক্ষা মাধ্যমগুলি হচ্ছে গৃহ এবং সমাজস্থ সকল সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও বহু চেতনা-সৃষ্টিকারী গণমাধ্যম সমূহ।

শিক্ষার বিধি বর্হির্ভূত মাধ্যম হচ্ছে সেইসব শিক্ষা বিতরণ কেন্দ্র যেগুলি বিধিবদ্ধ মাধ্যমগুলির মত সুনির্দিষ্ট সময়সূচী, পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার কথা বলে না।

শিক্ষা হল একটি জীবনব্যাপী মানবিক প্রয়াস। শিক্ষা ছাড়া আমাদের জীবনে কোন ক্ষেত্রেই অগ্রগতি বা সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিশ্বে শিক্ষাই জনগণের সমৃদ্ধির যাত্রা, কল্যান এবং নিরাপত্তা দান করে। জনগন হল বিশ্বের যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের প্রধান সম্পদ। জনগনের জনগনের উপরই নির্ভর করে কোনো একটি দেশের অগ্রগতি ও সাফল্য। সেইকারণে দেশের জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা এবং শিক্ষার প্রসার ঘটা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন গণমাধ্যম। জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমকে গণমাধ্যম বলে। গণমাধ্যম হল যে কোন রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ। শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমগুলি হল – (১) সংবাদপত্র, (২) বেতার (৩) দূরদর্শন (৪) চলচ্চিত্র ইত্যাদি। গণমাধ্যমগুলি শিক্ষার কাজকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে। বেতার ও দূরদর্শন সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান গ্রহণ করে শিক্ষার কাজকে যে অনেকখানি সহায়তা করে চলেছে তা আজ সর্বজনবিদিত। তাছাড়া সংবাদপত্রে মাধ্যমে গণশিক্ষার যে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাও গুরুত্বপূর্ণ। আবার প্রথাবর্হির্ভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে দূরাগত শিক্ষা হল এক বিশেষ ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা যা বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ।

৫.১৪ প্রশ্নাবলী (Questions) :–

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ–

১। শিক্ষার সংস্থা বলতে কী বোঝায়?

২। আধুনিক শিক্ষালয়ের সংজ্ঞা লিখুন।

৩। গণ মাধ্যমের সংজ্ঞা লিখুন।

৪। প্রথাগত শিক্ষা কাকে বলে?

৫। অপ্রথাগত শিক্ষা বলতে কি বোঝেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ–

১। প্রথাগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

২। অপ্রথাগত শিক্ষার পর্যালোচনা করুন।

৩। শিশুর সুষম বিকাশে গৃহের ভূমিক বিচার করুন।

৪। বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

৫। দূরাগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। শিক্ষার সংস্থা হিসাবে বিদ্যালয়ের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

২। শিক্ষায় গণমাধ্যমের শিক্ষাগত তাৎপর্য আলোচনা করুন।

৩। দূরশিক্ষার পর্যালোচনা করে আপনার মতামত সংক্ষেপে লিখুন।

৪। শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

৫। শিক্ষার গণমাধ্যম হিসাবে দূরদর্শনের প্রভাব আলোচনা করুন।

৫.১৫ উৎস Referances :

1.	শিক্ষা বিজ্ঞান –	অধ্যাপক কে. ব্যানার্জী
2.	শিক্ষার দার্শনিক ও সামাজিক ভিত্তি –	ডঃ উজ্জ্বল পান্ডা ডঃ স্বপন সেন ডঃ মিহির চট্টোপাধ্যায়
3.	শিক্ষার সামাজিক ভিত্তি –	ডঃ দেবাশিষ পাল
4.	শিক্ষা তত্ত্ব –	ডঃ ইন্দু ঘোড়ুই শান্তা দাশগুপ্ত
5.	শিক্ষার ভিত্তি ও সমাজ –	ডঃ দেবব্রত দেবনাথ ডঃ দেবাশিষ পাল সেখ হামিদুল হক
6.	শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন –	অধ্যাপক সুশীল রায়

একক : ছয়

জনসংখ্যা শিক্ষা

Population Education

গঠন (Structure)

৬.১ সূচনা

৬.২ উদ্দেশ্য

৬.৩ জনসংখ্যা শিক্ষার প্রকৃতি

৬.৪ জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি

৬.৫ জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য

- ৬.৫.১ জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কিত উদ্দেশ্য সমূহ
- ৬.৫.২ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কিত উদ্দেশ্যসমূহ
- ৬.৫.৩ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত উদ্দেশ্যসমূহ
- ৬.৫.৪ জনসংখ্যা ও পরিবেশ সম্পর্কিত উদ্দেশ্যসমূহ

৬.৬ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

৬.৭ জীবনশৈলী শিক্ষা

- ৬.৭.১ জীবনশৈলী শিক্ষার লক্ষ্য
- ৬.৭.২ মাধ্যমিক স্তরে জীবন শৈলী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
- ৬.৭.৩ পদ্ধতি
- ৬.৭.৪ জীবনশৈলী শিক্ষার পাঠক্রম
- ৬.৭.৫ জীবনশৈলী শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা

৬.৮ সারসংক্ষেপ

৬.৯ প্রশ্নাবলী

৬.১ ঃ সূচনা (Introduction)

জনশিক্ষা হল একটি ‘‘ শিক্ষামূলক কর্মসূচী যা জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উপাদানগুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয়ে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে শিক্ষার্থীর নিজের, তার পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি ও পৃথিবীর জনসংখ্যা বিষয়ক যে কোনো পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। জনসংখ্যা শিক্ষা সম্পর্কে পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশ-ই এখনও তেমনভাবে সাড়া ফেলতে পারে নি। কিন্তু জনসংখ্যা শিক্ষা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে আছে। জীবনযাত্রার মান নির্ধারণকারী উপাদানগুলির মধ্যে আছে জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতি, উন্নয়ণের ধাপ, সম্পদের ক্ষমতা এবং জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি, ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ণের একটি উপাদান এবং ইহা জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ জনসংখ্যা শিক্ষা হল এমন একটি শিক্ষা প্রক্রিয়া যা জনসংখ্যা ও উন্নয়ন, জনসংখ্যা পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল এবং জনসংখ্যা সুস্থিতির শর্তগুলি নিরপেক্ষভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারে। এই শিক্ষা তাদের মধ্যে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে যুক্তিপূর্ণ মনোভাব দ্বারা বিবেচনা করার ও সেগুলির প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ সম্পাদন করার মতো সচেতনতা গড়ে তোলে।

৬.২ উদ্দেশ্য (Objectives) :

এই অধ্যায় পড়ার পর শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে সমর্থ হবে —

ক) জনসংখ্যা সম্পর্কিত ধারণা জন্মাবে।

খ) মাধ্যমিক স্তরে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি তা বুঝতে পারবেন।

গ) জন সংখ্যা শিক্ষার বিভিন্ন উপায়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ঘ) জীবনশৈলী শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

ঙ) জীবনশৈলী শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা কি সে সম্পর্কে অবহিত হবেন।

জনসংখ্যা শিক্ষা ঃ

‘জনসংখ্যা শিক্ষা’ কথাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে দুটি শব্দ — জনসংখ্যা ও শিক্ষা। জনসংখ্যা বলতে আমরা বোঝাতে চাই — কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা আর এই সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে — সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য বিষয়ক, শিক্ষাবিষয়ক, মানবিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ ইত্যাদির সচেতনতা জাগিয়ে তোলার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি হল জনসংখ্যা শিক্ষা।

৬.৩ ঃ জনসংখ্যা শিক্ষার প্রকৃতি

অনেকে জনসংখ্যা শিক্ষাকে যৌন শিক্ষা বা পরিবার কল্পনার শিক্ষার সঙ্গে এক হিসাবে বিবেচনা করেন। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। জনসংখ্যা শিক্ষা আমাদের জনসংখ্যা ও শিক্ষার মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ককে অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। জনসংখ্যা শিক্ষা হচ্ছে সমগ্র শিক্ষা পদ্ধতির সেই অংশ

যা আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ও ফলাফল সম্পর্কে সচেতন করে এবং তদানুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবেশের মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। তাই প্রকৃতিগতভাবে জনসংখ্যা শিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষা প্রচেষ্টার অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস যা মানবজাতিকে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজ জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সকলের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করার জন্য সচেতন করে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন সংস্থা ও গবেষকগণ জনসংখ্যা শিক্ষার ধারণা দিয়েছেন। সেগুলি হল —

১) চিকিৎসকেরা জনসংখ্যা শিক্ষাকে পরিবার সীমিত রাখার প্রচেষ্টা হিসাবে গণ্য করেন। পরিবারের আয়তন ছোটো রাখার জন্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার ওষুধপত্র তথা ব্যবহার্য সামগ্রীর রূপায়ণে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই হল জনসংখ্যা শিক্ষা।

২) অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণায় জনসংখ্যা, শিক্ষা , দেশের বিকাশ, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, স্বনির্ভরতা, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাঁদের মতে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কৌশল ও জনসংখ্যার মনোন্নয়নের উপর ব্যক্তি তথা সমাজের উন্নতি নির্ভর করে।

৩) UNESCO এর ভাষায় জনসংখ্যা শিক্ষা হল— 'Population education is an educational programme which provides for a study of the population situation in the family, community, nation and world, with the purpose of developing in the students rational and responsible attitudes and behaviour towards that situation.'

৪) ভারতের পরিবার পরিকল্পনা সংস্থার সভাপতি শ্রীমতী এ বি ওয়াদিয়ার ভাষায় "Population education is primarily an education programme dealing with the influence of population trends on society and the individual. Education is not population dynamics, is not propoganda or promoting a set of bodies but a way of conveying knowledge and creating awareness which will help, in course of time, to bring about new attitudes and behaviour pattern."

বিবর্তনের ধারায় বর্তমান জনসংখ্যা শিক্ষার ধারণাকে J.L. Pandey উপস্থাপিত করেছেন — Population Education is defined as an educational process which develops among learners an understanding of inter-relationships between population and development, causes and consequences of population change, and the critically of the conditions for population stabilization. It inculcates in them rational attitude and responsible behaviour towards population and development issues, so that they may make informed decisions. অর্থাৎ জন সংখ্যা শিক্ষা হল এমন একটি শিক্ষা প্রক্রিয়া যা জনসংখ্যা ও উন্নয়ন, জনসংখ্যা পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল এবং জনসংখ্যার সুস্থিতির শর্তগুলি নিরপেক্ষভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারে। এই শিক্ষা তাদের মধ্যে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে যুক্তিপূর্ণ মনোভাব দ্বারা বিবেচনা করার ও সেগুলির প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ সম্পাদন করার মতো সচেতনতা গড়ে তোলে।

৬.৪ ঃ জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি (Scope of Population Education)

সাধারণভাবে বলা যায় যে, জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। জনসংখ্যা শিক্ষা শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষেই সীমাবদ্ধ নয়, দেশের সমস্ত জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র পর্যন্ত এর বিস্তৃতি।

এর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা যায় —

ক) শিক্ষার্থীর নিজের দেশ এবং সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও ধারণা গঠন।

খ) শিক্ষার্থীর নিজের দেশের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যা পরিস্থিতির পারস্পরিক সম্পর্কের সচেতনতা।

গ) শিক্ষার্থীর নিজ গোষ্ঠী তথা দেশের গৃহীত জনসংখ্যা নীতির ভিত্তিতে, তার পরিবারের আয়তন ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত সুবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতার বিকাশ।

ঘ) শিক্ষার্থীকে জনসংখ্যা সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টি ভঙ্গি, মূল্যবোধ ও মূল্যায়ন ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা প্রদান।

ঙ) জনসংখ্যার প্রকৃতি, বৃদ্ধি-হ্রাসের কারণ, পরিবর্তন, বৈশিষ্ট্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিস্তৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা।

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্লোয়ান আর ওয়েল্যান্ড জনসংখ্যা রাশির পরিবর্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করেছেন —

ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাঃ নিজেদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম হার ও মৃত্যুহরের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃতি শিক্ষার্থীদের জানানো। যেমনভাবে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্রসর হবে, তেমনিভাবে তারা ধীরে ধীরে নিজ রাজ্য, দেশ ও বিশ্বের জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে।

খ) মানব প্রজনন কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা গঠিত হওয়া। শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও পরিনমণের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরে এই ধারণা গঠিত হবে।

গ) সন্তান ধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা গঠিত হওয়া। এ সম্পর্কে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরীক্ষিত তথ্যের সঙ্গে পরিচিতির মাধ্যমে — (১) স্বল্প বয়সে বা অধিক বয়সে সন্তান ধারণের সঙ্গে মায়ের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক; (২) শিশুর পুষ্টিতে মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা ও তার জন্য মায়ের সুস্বাস্থ্যের সম্পর্ক ইত্যাদি।

ঘ) পরিবারের গঠন ও আয়তনের সঙ্গে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা আনয়ন।

ঙ) দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যার বৈশিষ্ঠ্য ও তৎসম্পর্কিত নীতিগুলির তাৎপর্য অনুধাবন।

চ) নিজের দেশের জনসংখ্যার নীতি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর পরিচিতি।

এই সম্পর্কে Dr. S. C. Cool (1969) বলেছেন "Population education must go beyond the classrooms into the homes, the temples, the bazaars, the firms, the factories and, indeed, into every aspect of human life."

৬.৫ ঃ জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Population Education)

জনসংখ্যা শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহকে ৪টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কিত উদ্দেশ্যসমূহ।

২) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্কিত উদ্দেশ্যসমূহ।

৩) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত উদ্দেশ্যসমূহ।

৪) জনসংখ্যা ও পরিবেশ সম্পর্কিত উদ্দেশ্যসমূহ।

৬.৫.১ . ঃ (১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কিত উদ্দেশ্যসমূহ

এই শ্রেণীভুক্ত উদ্দেশ্যগুলি হল —

তরুণ প্রজন্মকে,

(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন বিষয়, যথা — কারণ, প্রকৃতি, প্রভাবক ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা।

(খ) জন্মহার ও মৃত্যুহার সম্পর্কে অবহিত করা এবং এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

(গ) সরকার গৃহীত জনসংখ্যা নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা।

(ঘ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করা।

৬.৫.২. ঃ (২) জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কিত উদ্দেশ্যসমূহ

এই উদ্ধেশ্যগুলির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে —

(ক) জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মানের সম্পর্ক আলোচনা করার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব স্পষ্ট করা।

(খ) দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব অবহিত করা।

(গ) অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রোগ বিস্তার সম্পর্কে অবহিত করা।

(ঘ) ছোটো পরিবারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারবে।

(ঙ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতিগুলি অবহিত হবে।

৬.৫.৩. ঃ (৪) জনসংখ্যা ও পরিবেশ সম্পর্কিত উদ্দেশ্য সমূহ

এই উদ্দেশ্যগুলির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে —

(ক) জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক তথা সামাজিক পরিবেশের সম্পর্কে অবহিত করা।

(খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জল, বায়ু, মাটি ও শব্দ দূষণের সংযোগ উপলব্ধিতে সহায়তা করা।

(গ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মানের অবনমনের সম্পর্ক অবহিত করা।

(ঘ) অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হয়ে কীভাবে ভারসাম্যের অভাব ঘটিয়ে মানব প্রজাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে তা অবহিত করা।

উপরোক্ত ৪টি প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য NCERT এর বিশেষজ্ঞরা সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের দেশের উন্নয়নের পথে অন্যতম বড়ো অন্তরায় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সে সম্পর্কে সকলকে সচেতন হতে হবে। দেশের প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি পরিবারকে এই ধারণা উপলব্ধি করতে হবে যে, জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে গেলে পরিবার ছোটো ও সীমিত রাখা দরকার। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অল্পবয়স থেকে এই ধারণা তৈরী করা সম্ভব হলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জনসংখ্যাবৃদ্ধি জনিত সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারবে।

জনসংখ্যা শিক্ষার এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিক্ষার্থীর পরিপ্রেক্ষিতে শিখনমূলক উদ্দেশ্যগুলিকে ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—

(ক) জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্যাবলি

(খ) দক্ষতামূলক উদ্দেশ্যাবলি

(গ) মনোভাব ও আগ্রহমূলক উদ্দেশ্যাবলি।

(ক) জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্যাবলি ঃ

শিক্ষার্থীরা এইসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে -

(অ) জনসংখ্যার ঘনত্ব, পরিমাণ (সাময়িকভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া), কোনো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাকাপাকিভাবে বাস করতে যাওয়া বা আসা ইত্যাদি।

(আ) এই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জনসংখ্যার ঘণত্বের কম বেশী হওয়ার কারণ।

(ই) জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান।

(ঈ) জনসংখ্যা ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক।

(উ) পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের চাহিদার পরিবর্তনশীলতা।

(ঊ) শিল্পায়নের ফলে পরিবেশের রূপান্তর হওয়া।

(ঋ) অতীতের সঙ্গে বর্তমান পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ বিশ্লেষণ।

(ঌ) জন্মহার, মৃত্যুহার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সম্পর্কে সম্যক ধারণা।

(এ) খাদ্য সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে কীভাবে খাদ্য সমস্যার সমাধান করা যায়, তা জানা।

ঐ) শক্তির সংকট সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং শক্তি অপচয় রোধ তথা অপ্রচলিত শক্তির উৎসগুলিকে কাজে লাগানো।

ও) বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় ও অবলুপ্তি সম্পর্কে সচেতনতা ও প্রতিরোধ সচেষ্টতা।

ঔ) পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও পুর্নব্যবহার অযোগ্য সম্পদ, তার প্রয়োগ ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে পরিচিতি।

খ) দক্ষতামূলক উদ্দেশ্যাবলী ঃ

শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলিতে দক্ষতা অর্জন করবে—

অ) জনসংখ্যা সম্পর্কিত মানচিত্র, সরণি লেখচিত্র অনুধাবন করতে পারা।

আ) বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন জনঘনত্ব অনুযায়ী জনসংখ্যার মানচিত্র তৈরী করতে পারা।

ই) জনসচেতনতা আনয়নে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কিত সহজবোধ্য পোস্টার তৈরী করতে পারা।

ঈ) জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত পরিবেশ দূষণের কুফলের সম্পর্কিত সহজবোধ্য পোস্টার তৈরী করতে পারা।

উ) জনসংখ্যা পিরামিড অনুধাবন করতে পারা ও তৈরী করতে পারা।

গ) মনোভাব ও আগ্রহমূলক উদ্দেশ্যাবলী ঃ

অ) জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য আহরণ ও বিশ্লেষণে আগ্রহী হওয়া এবং তৎসম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপে অংশগহণের ধনাত্মক মানসিকতা গঠন করা।

আ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশের পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়ে আগ্রহী হওয়া এবং জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য ধনাত্মক মনোভাব গঠন করা।

ই) পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য আহরণ ও বিশ্লেষণে আগ্রহী হওয়া এবং তৎসম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের ধনাত্মক মানসিকতা গঠন করা।

জনসংখ্যা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষাসূচী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এই উদ্দেশ্যগুলি কোনোভাবেই পূরণ হবে না, বরং এই উদ্দেশ্যগুলিকে সামনে রেখে বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের পাঠ্যসূচীকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি পূরণ হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও পরিমাণে আমাদের দেশ আজ যে জায়গায় উন্নীত হয়েছে, তাতে অত্যন্ত জরুরীভাবে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রসার না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

৬.৬ঃ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

১৯৬৯ সালে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ও ভারত সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী Dr. V.K.R.V.Rao জনসংখ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, "Population education is a subject by itself and should essentially be treated as a part of the much large subject of human resource development, and be included in the educational framework in the light of this opinion." জনসংখ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতি, 1986 এর রূপায়ণ কল্পে সুপারিশ (যেটি programme of Action [POA], 1992, নামে পরিচিত) বলা হয়েছে— "Population education must be viewed as an important part of the nation's strategy to contain the growth of population. Starting at the primary and secondary levels with inculcation of consciouness about the looming crisis due to expansion of population, educational programmes should actively motivate and inform youth and adults about family planning and responsible parenthood."

এটা বাস্তব যে, আজকের শিশু কালকের নাগরিক হচ্ছে— অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে সময়ের দায়িত্ব বহনের জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে আমাদের দেশ তথা সারা পৃথিবীতে মৃত্যুর হার কমেছে ও মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বেড়েছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সারা পৃথিবীতি বিশেষত ভারতবর্ষে অত্যন্ত উদ্বেগের কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হল - মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা ও জনসমষ্টির সুন্দর জীবনযাপন সুনিশ্চিত করা।

আধুনিক বিশ্বে বিধিবদ্ধ শিক্ষাকালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই স্তরেই প্রাক্-কৈশোর স্তর থেকে পরবর্তী কৈশোর পর্যন্ত শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে। এই স্তরের প্রধান উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং তাকে সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত করা। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩) মাধ্যমিক শিক্ষার নিম্নরূপ উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন—

(ক) নাগরিকতার প্রশিক্ষণ (খ) বৃত্তিমূলক চেতনা ও ক্ষমতার বিকাশসাধন; (গ) চারিত্রিক বিকাশ সাধন ও (ঘ) নেতৃত্বের বিকাশসাধন। অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরেই শিক্ষার্থী জীবনযাপনের উপযোগী বৃত্তি অর্জনে সক্ষম হয়। স্বাবলম্বী ও চরিত্রবান (-বর্তী) হয়ে দেশের/সমাজের উপযুক্ত নাগরিকে পরিণত হয়ে দেশ ও সমাজকে নেতৃত্ব দেবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের জনসংখ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এভাবে উল্লেখ করা যায় -

১) আজ যে শিক্ষার্থী পঞ্চম/ষষ্ঠ শ্রেণীতে অপরিণত বালক/বালিকা হিসাবে প্রবেশ করছে, দ্বাদশ শ্রেণীর পর সেই শিক্ষার্থীই পরিণতোন্মুখ প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে নিজের তথা পরিবারের তথা সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য হওয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হচ্ছে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনযাপন করার সমস্ত যোগ্যতা নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যগুলি এই সময়কালে সেই শিক্ষার্থীর মধ্যে বিকাশ লাভ করছে। তাই তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যতে নিজের/সমাজের মঙ্গলার্থে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাবের বিকাশ করার এটাই উপযুক্ত সময়।

২) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর মন পরবর্তী শিক্ষাস্তর অপেক্ষা অনেক নমনীয় থাকে। সহজেই কোনো নতুন ধারণা বা মনোভাব তাদের মধ্যে সঞ্চার করা যায়। তাই জনসংখ্যা শিক্ষাও এই স্তর থেকে শুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩) এই স্তরে শিক্ষার্থীদের ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলির অনুশীলন করতে হয়। জনসংখ্যা শিক্ষাও ওইসব বিষয়ের মধ্যেই সুচারুরূপে শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে পারে। যেমন - ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে এমন কাহিনী/প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল শিক্ষার্থীর মনে দৃঢ় বদ্ধ হতে পারে। অনুরূপ গণিতের সমস্যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল শিক্ষার্থীর মনে দৃঢ়বদ্ধ হতে পারে। অনুরূপ গণিতের সমস্যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিসেবার সম্পর্ক উত্থাপিত করা যেতে পারে। বিজ্ঞানে বিশেষত জীবনবিজ্ঞানে জননতন্ত্র, প্রজনন কৌশলের বিভিন্ন দিক, ডারউইন তত্ত্ব, মেন্ডেলের তত্ত্ব, প্রজনন ও স্বাস্থ্য ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যার দিকগুলি উল্লিখিত হতে পারে। অনুরূপভাবে সমাজ বিজ্ঞানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সামাজিক তাৎপর্য উত্থাপন করা যায়।

৪) জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য জনসাধারণকে শুধুমাত্র জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতন করা তাই নয়, মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধিকে শুধু বোঝা না ভেবে কীভাবে তাকে প্রকৃত অর্থে কাজে লাগিয়ে মানবসম্পদরূপে পরিগণিত করা যায় -তাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে এই চেতনার বিকাশ ঘটলে, তবেই উপযুক্ত মানবসম্পদ বিকাশ সম্ভব হবে।

৫) জনসংখ্যার সঙ্গে যে ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের পরিকল্পনা ও অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান এই বোধ শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগিয়ে তোলার উপযুক্ত সময় হল মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর।

৬) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর সমাপনের পরেই শিক্ষার্থীরা প্রজনন ক্ষমতা অর্জনের বয়সে পৌঁছায়। তাই কম বয়সে মাতৃত্ব/পিতৃত্ব যে শারীরিক সুস্থতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে- এ সম্পর্কে সচেতনতা জনসংখ্যা শিক্ষার মাধ্যমে নিয়ে আসা সম্ভব। তাই এই স্তর থেকেই জনসংখ্যা শিক্ষার প্রবর্তন অধিকরতর কাম্য।

৬.৭ ঃ জীবনশৈলী শিক্ষা (Life Style Education)

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রবেশের সময় যে শিক্ষার্থী তার বাল্যকালে থাকে, সেই শিক্ষার্থীই এই স্তরে কৈশোরাবস্থা প্রায় অতিক্রম করে ফেলে। পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত একটি বালক-বালিকা তার দৈহিক পরিণতি ও অভিজ্ঞতার জন্যই যে মানসিক পরিণতির স্তরে থাকে, সেই-ই পরবর্তী ২/৩ বৎসরের মধ্যে কিশোর/কিশোরীতে পরিণত হয়। জীবন বিকাশের স্তরের এই পরিবর্তন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পেরেছি। সঠিক কারণেই কৈশোরের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক দিকগুলিকে মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম রচনার সময় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কৈশোরের শিক্ষায় এই বয়সের ছেলেমেয়েদের পরিবার ও সমাজে যথাযথভাবে জীবন যাপনে সক্ষম করে তোলার জন্য সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়ের অনুশীলন প্রয়োজন।

জীবনশৈলীর শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যা মানুষকে সঠিকভাবে ও সকলের পক্ষে মঙ্গলদায়ক জীবনযাপন করতে শেখায়। বাল্যকাল থেকে কৈশোরের মধ্য দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পথে, শিক্ষার্থীদের যে সমস্ত কার্যক্রম-এর মাধ্যমে পরবর্তী জীবনে পরিবার ও সমাজে বিজ্ঞানসম্মত ও যথাযথভাবে অভিযোজন করে জীবনযাপনে সক্ষম করে তুলতে সাহায্য করে তাই হল জীবনশৈলী শিক্ষার কার্যক্রম।

জীবনশৈলী শিক্ষার শ্রেণীবিভাগ ঃ

জীবনশৈলী শিক্ষার মূল ধারণার প্রেক্ষিতে এর কার্যক্রমকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়-

ক) **শারীরিক কার্যাবলী ঃ** যৌন অঙ্গসমূহ, তাদের কাজ, বিকাশ ও স্বাস্থ্যসম্মত যত্ন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যাখ্যা দেওয়া যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে এই সংক্রান্ত সমস্ত সংশয় নিরসন হয় ও ভুল ধারণা ও বিশ্বাস দূর করা যায়।

খ) **মানসিক ঃ** উক্ত প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদের কাছে তথ্য ও ব্যাখ্যা এমনভাবে তুলে ধরতে হবে, যাতে তারা অভিজ্ঞতা ও অবদমিত কৌতুহলজনিত উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং অন্যান্য মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

গ) **সামাজিক ঃ** পরিবার থেকে শুরু করে বৃহত্তর সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত আচরণ বিধি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করতে হবে। বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের, শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্ককে মধুর করে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি মর্যাদাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। লিঙ্গ-সমতার ধারণা শিক্ষার্থীদের মনে গড়ে তুলে তার প্রতি তাদের বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে।

ঘ) **সাংস্কৃতিক ঃ** সংবেদনশীল ও সুস্থ মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য যথাযথ সংস্কৃতির চর্চা অপরিহার্য। সমাজকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য ও সমষ্টিগত জীবনযাপনের মানসিকতা তৈরী করার জন্য উচ্চমানের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে হবে। নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের সৃজনশীলতাকে সঠিক অভিমুখে প্রবাহিত করতে হবে।

ঙ) **নৈতিক ঃ** সমাজে সকলের সঙ্গে যৌথভাবে জীবনযাপনের মানসিকতা, সমষ্টির স্বার্থকে নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের ওপরে স্থান দেওয়া, সমাজ স্বীকৃত প্রচলিত আচরণবিধিকে শ্রদ্ধা করা, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলি বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মানসিকতা অর্জন ইত্যাদির মতো নীতিবোধগুলি জীবনশৈলী শিক্ষার মাধ্যমে সঞ্চারিত করতে হবে।

৬.৭.১ ঃ জীবন শৈলী শিক্ষার লক্ষ্য

ক) কৈশোরে শিক্ষা প্রার্থীদের চরিত্রে বিশেষ কয়েকটি গুণ সঞ্চারিত করা যার সমন্বয়ে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাপনের জন্য সুস্থ ও পূর্ণ সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব বিকাশলাভ করতে পারে।

খ) এইসব সামাজিক গুণগুলির যথাযথভাবে উপলব্ধির পর সেগুলিকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আচরণ সম্পাদনের মাধ্যমে প্রয়োগ করার দক্ষতা অর্জন করতে কিশোর-কিশোরীদের সাহায্য করা।

গ) বয়ঃসন্ধিকালীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে জীবন কুশলতার যথাযথভাবে বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তাদের ওই বয়সের সমস্যাগুলি সার্থক সমাধানে সাহায্য করা।

ঘ) আধুনিক বিশ্বের ত্রাস সৃষ্টিকারী মারণব্যাধি ‘HIV / AIDS’ -এর প্রসার সম্পর্কে যথাযথ সচেতনতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তোলা।

ঙ) বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জীবন দক্ষতাগুলি আয়ত্ত করতে কিশোর কিশোরীদের সাহায্য করা।

জীবন দক্ষতার ধারণা ঃ

সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনে যে সমস্ত দক্ষতাগুলি প্রয়োজন সেগুলিই জীবন দক্ষতা। একজন পরিপূর্ণ মানুষের মধ্যে যে সব দক্ষতা আশা করা যায় সেগুলি প্রধানত দুই প্রকারের হতে পারে—

১) **উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা ঃ** শারীরিক, বৌদ্ধিক ও মানসিক ক্ষমতার সুসমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে পণ্য বা পরিষেবা উৎপাদন করা কিংবা ওই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা। এই উৎপাদন ভোগপণ্য বা পরিষেবা হতে পারে অথবা নান্দনিক মূল্যসম্পন্ন সৃষ্টিও হতে পারে।

২) **সামাজিক ও চারিত্রিক দক্ষতা ঃ** সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে সমষ্টির স্বার্থের অনুকূল যে সব মনোভাব ও আচরণ সমাজ দ্বারা স্বীকৃত, সেগুলির উপলব্ধিকে সাধারণ অর্থে মূল্যবোধ নামে অভিহিত করা হয়। এই উপলব্ধিই হল মূল্যবান আচরণগুলি সম্পর্কে ধারণা ও বিশ্বাস। সমাজ স্বীকৃত এই সব মূল্যবোধ ও সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় রীতিনীতিগুলিকে উপলব্ধির মাধ্যমে গ্রহণ করলেই মানুষের চরিত্র নৈতিকতায় সমৃদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হয়। আর এই অন্তর্নিহিত গুণাবলি যখন মানুষের আচরণে প্রতিফলিত হয়, তখনই তা দক্ষতা হিসাবে স্বীকৃত হয়। 'আমার কী করা দরকার' এই উপলব্ধি হল আমার 'চরিত্রের গুণ'। আবার 'আমি কীভাবে এটা করতে পারব', তা বুঝে নিয়ে কার্যক্ষেত্রে সেই গুণকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করাই হল আমার 'চারিত্রিক দক্ষতা।'

কৈশোরের মানসিক অস্থিরতার মধ্যে কিশোর-কিশোরীদের যে বিশাল সুপ্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পারলেই এই সমাজের পক্ষে সার্থক চরিত্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এই বয়সে প্রয়োজনীয় সাধারণ জীবন দক্ষতাগুলি সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হল -

ক) **আত্ম উপলব্ধি ঃ** নিজেকে সঠিকভাবে জানতে পারাই আত্মোপলব্ধি। আমি কে, আমি কি পেতে চাই, কি হতে চাই, তার জন্য কী কী করতে হবে, কতটা আমি পারি, কোথায় আমার দুর্বলতা ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেওয়ার কৌশল কিশোর-কিশোরীকে আয়ত্ত করতে হবে। তাহলেই তারা জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে উদ্‌বেগহীনভাবে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

খ) **আত্ম মর্যাদাবোধ ঃ** নিজেকে জানার সাথে সাথেই শিক্ষার্থীদের নিজের সম্পর্কে বাস্তবোচিত মূল্যায়ন করতে শেখা দরকার। এই মূল্যায়ন তাকে সমাজে নিজে স্থান বুঝে নিতে সাহায্য করবে। অহমিকা বা হীনমন্যতা — এই দুই ক্ষেত্রেই সে চরম মনোভাব পরিহার করে, নিজের মর্যাদা বুঝে নিতে সমর্থ হবে।

গ) **আত্মপ্রকাশ ঃ** কৈশোরকাল নিজেকে প্রকাশ করার কাল। মনের জানালা হুট করে খুলে দেওয়া, সুখের অনুভূতি বা অব্যক্ত যন্ত্রণা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছা এই বয়সে প্রবল হয়ে ওঠে। এইসব ইচ্ছা সঠিকভাবে পূরণ করতে পারার কুশলতা একটি মূল্যবান দক্ষতা। এই দক্ষতা কিশোর-কিশোরীদের মনের ভার লাঘব করে, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করে। তবে এই দক্ষতা আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম দিতে পারে, যা বর্তমান সমাজের একটি বড়ো ব্যাধি। একজন সুনাগরিক তার নিজের আশা ও চাহিদাকে যেমন পূরণ করতে চাইবে, তেমনি তার কাছে সমাজের কী প্রত্যাশা সে সম্পর্কেও সে অবহিত থাকবে। তাকে এটাও জানতে হবে যে, নিজের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে তাকে প্রয়োজনীয় দায়িত্বও পালন করতে হবে।

ঘ) **সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যার সমাধান ঃ** সবসময় ও সব কাজের ক্ষেত্রেই মানুষকে নানারকম সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আর এটা তাকে করতে হয় ছোটবেলা থেকেই। প্রতি ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তের যথার্থতা নির্ভর করছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিবেচনা শক্তির ওপর। বিজ্ঞানসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতির মূল ধাপগুলি হল —

১) **সমস্যাটির চিহ্নিতকরণ ঃ** সমস্যাটির সমস্ত লক্ষণ বা উপসর্গগুলির গভীরে গিয়ে তাকে সঠিকভাবে চিনতে পারাই হল প্রথম ধাপ।

২) **সমস্যাটির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ঃ** উৎপত্তি, কারণসমূহ, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পরিণাম ইত্যাদির ভিত্তিতে সমস্যাটি বিশ্লেষণ করলে তার স্বরূপ উন্মোচিত হবে।

৩) **বিকল্প সমাধানসমূহ অনুসন্ধান ঃ** প্রায় সব সমস্যার একাধিক সমাধানের পথ থাকে। এগুলির মধ্যে কোনো সমাধান স্বল্পায়াসে বা স্বল্পব্যয়ে হতে পারে, আবার কোনও সমাধানের জন্য দীর্ঘ প্রচেষ্টা বা অধিক ব্যয় হতে পারে। কোনো সমাধান সমস্যাটির সব দিক সুচারুরূপে সাধন করে, আবার কোনোটিতে বা অত সুন্দর না হতেও পারে। কিন্তু সমাধানের আগে তা বোঝা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী যতগুলি সমাধানের পথ থাকতে পারে তার সবগুলিকে খুঁজে নেওয়া দরকার।

৪) **বিকল্প পথগুলির মূল্যায়ন ঃ** যে বিকল্প পথগুলিকে আগের পর্যায়ে খুঁজে পাওয়া যাবে তার সবগুলিকে কাম্যতা ও সম্ভাব্যতার নিরিখে যাচাই করে দেখতে হবে।

৫) **শ্রেষ্ঠ বিকল্প বাছাইকরণ ঃ** উপরোক্ত ধাপে পাওয়া মূল্যায়নের ভিত্তিতে সবচেয়ে কাম্য বিকল্পটিকে বেছে নিতে পারলে তবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটি সুসম্পন্ন হবে।

এটা ঠিক যে, বাস্তবে আমরা সবসময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সব ধাপগুলি অনুসরণ করে উঠতে পারি না। কিন্তু পদ্ধতিটির সঙ্গে পরিচয় থাকলে এবং সচেতনভাবে প্রয়োগ করার অভ্যাস গড়ে তুললে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজ অনেক সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসূ হতে পারবে।

বয়ঃসন্ধিকালে ‘সিদ্ধান্ত গ্রহণ’ দক্ষতাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেন না এই বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রায় সবসময়ই কোনো না কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেগুলির কিছু তাদের কাছে একান্ত ব্যক্তিগত বলে মনে হয় যা বাবা-মাকেও বলতে তারা দ্বিধাবোধ করে। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়া, নিজের সমস্যা নিজেই মেটাবার তাগিদ তারা অনুভব করে। তাই জীবন শৈলীর শিক্ষায় এই দক্ষতার বিকাশসাধন একান্ত প্রয়োজনীয়।

৬) **মত প্রকাশের দৃঢ়তা ঃ** অনেক সময়েই দেখা যায় যে, কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের কর্তব্য-অকর্তব্য স্থির করতে পারে, কিন্তু নিজের মতামত চূড়ান্ত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। অকারণ রূঢ়তা এড়িয়ে, নিজের মত স্পষ্ট করে জানানো এবং সেই অবস্থানে অবিচল থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৭) **আবেগ নিয়ন্ত্রণ ঃ** মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আবেগ একটি মূল্যবান সম্পদ। মানুষের প্রতি ভালোবাসা, অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে সুস্থ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের ভিত্তিই হচ্ছে পবিত্র আবেগ। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত আবেগের প্রাবল্য কখনো কখনো মানুষের বিবেচনাকে আচ্ছন্ন করে তোলে, তাই আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখার দক্ষতা অত্যন্ত মূল্যবান।

৮) **চাপ সহ্য করা ঃ** কৈশোরের স্বপ্ন সবসময় বাস্তবে পরিপূর্ণ হয় না। দৈনন্দিন জীবনে নানা ব্যর্থতা তাদের পীড়িত করে। জীবিকার অনিশ্চয়তা তাদের আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরায়। এইগুলি কৈশোরের চাপের অন্যতম কারণ। এই চাপের যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে না পারলে, তাদের মানসিক ভারসাম্য

বিঘ্নিত হতে পারে। তাই যুক্তিবাদী মন দিয়ে বিচার করে, বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের এই চাপ সহ্য করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

৬.৭.২ ঃ মাধ্যমিক স্তরে জীবন শৈলী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

১) বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তির দেহমনে যে আলোড়ন হয়, তার পরিসমাপ্তি ঘটে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পৌঁছে। প্রতিটি শিশু কালক্রমে বালক-বালিকা থেকে যুবক-যুবতীতে রূপান্তরিত হয়। দৈহিক পরিবর্তন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই হয়, কিন্তু মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি সুষ্ঠু ও কাম্য বিকাশের জন্য অনেকাংশেই শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে যৌনবিকাশ সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা তথা কৌতূহলগুলি যথাযথভাবে উত্তর পায় না, নানারকম অলিখিত সামাজিক বাধার জন্য। এই কৌতূহলগুলিকে চরিতার্থ করার জন্য কিশোর-কিশোরীরা সমাজের চোখে অন্যায়ভাবে বা বিকৃতভাবে কিছু কিছু কাজ করে থাকেন। অথচ যা প্রতিটি জীবনের জন্য স্বাভাবিক, যা প্রতিটি মানুষকে তার জীবনকালে অতিক্রম করতে হয়, তার বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় বাধা থাকার কথা নয়। জীবনযাপনের এই বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার জন্যই জীবনশৈলী শিক্ষার প্রয়োজন।

২) ব্যক্তিসত্তার সুস্থতা ও স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে সুস্থ জীবনযাপনের উপর। মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করার পরেই পারিবারিক জীবনে যোগদান করার প্রবণতা আসে। তাই এই স্তরের শেষে সুস্থ জীবনের জন্য প্রয়োজন জীবনশৈলীর শিক্ষা।

৩) সমাজে আজ যৌন অপরাধের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই কৈশোরে বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে অসমর্থ হয়েছে। সমানাধিকারের ও সম্মানের সঙ্গে যৌথভাবে জীবনযাপনের জন্য জীবন শৈলী শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

৪) ভয়ংকর ও মারাত্মক এইডস রোগের দ্রুত বিস্তার সমাজকে আজ উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এই রোগের প্রতিরোধ ছাড়া প্রতিকারের কোনো উপায় নেই। উপযুক্ত জীবন শৈলীর শিক্ষার মাধ্যমে এই প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। তাই এর প্রয়োজন।

৫) যে কোনো সমাজে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের জন্য প্রয়োজন নর-নারীর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ। এটা তখনই সম্ভব, যখন বেড়ে ওঠার পথে বালক-বালিকা থেকে কৈশোরের মাধ্যমে নর নারীতে রূপান্তরিত হওয়ার পথে, তাদের উভয়ের পারস্পরিক স্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে তারা সঠিকভাবে সচেতন হবে। জীবনশৈলীর শিক্ষা একটি সচেতনতা ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চার করতে পারে, তাই মাধ্যমিক স্তরে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৬) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে থাকাকালীন শিক্ষার্থী থাকে নমনীয় ও বিকাশোন্মুখ, নৈতিক চেতনার উন্মেষে এক জাগ্রত ব্যক্তিসত্তা। এই স্তরে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো ধরনের শিক্ষা প্রচেষ্টার অতি উত্তম সময়। তাই এই স্তরে জীবনশৈলী শিক্ষার শুরু কাম্য।

৬.৭.৩. ঃ জীবন শৈলী শিক্ষার পদ্ধতি

গতানুগতিক একমুখী বক্তৃতা পদ্ধতির পরিবর্তে অনুশীলন, প্রশ্নোত্তর ও দলগত আলোচনা হবে জীবনশৈলী শিক্ষার পদ্ধতি। এক্ষেত্রে যে যে দিকগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার সেগুলি হল—

১) **দলের কাজ ঃ** ছোট ছোট দলের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন বা আলোচনা। এই দল তৈরী হবে আগ্রহের নৈকট্যের ভিত্তিতে। ছাত্রছাত্রীদের দল গঠন করার স্বাধীনতা থাকবে। দলের প্রত্যেক সদস্যকে কোনো না কেনো দায়িত্ব অর্পণ। সুশৃঙ্খলভাবে দলগত কাজ করার জন্য উপস্থাপক, সময়-নির্ধারক, অনুলেখক ইত্যাদির নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকবে।

২) **চিন্তার আলোড়নের অধিবেশন ঃ** অধিবেশনের সময়সীমা সংক্ষিপ্ত হবে। আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের সব মতামতকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। মতামতগুলি বোর্ডে লিখে নিতে হয়। সেগুলির ওপর আলোকপাত বা আলোচনার পর গুরুত্ব অনুযায়ী সেগুলিকে সাজিয়ে নেওয়া দরকার। সাধারণভাবে —

অ) স্পর্শকাতর ও বিতর্কিত বিষয়ের ব্যাখ্যায়

আ) আলোচনায় দ্বিধাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করায় ও

ই) খুব কম সময়ে বেশি মতামত পাওয়ার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর হতে পারে।

৩) **আলোচনা ঃ** ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে।

৪) **প্রশ্নোত্তর ঃ** শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তা ও সেই সমাধানের জন্য প্রশ্নোত্তর কার্যকরী হতে পারে।

৫) **কল্প-নাটকাভিনয় ঃ** বাস্তব জীবনে ঘটেছে বা ঘটতে পারে এমন কোনো ঘটনার স্বল্প সময়ের এবং স্বতঃস্ফূর্ত কাহিনীর উপস্থাপনাকে কল্প-নাটকাভিনয় বলে। কারও আচরণে গঠনমূলক পরিবর্তন সুনিশ্চিত করতে এই পদ্ধতি কার্যকরী হতে পারে।

৬) **পরিস্থিতি বা সমস্যার বিবরণ উপস্থাপনা ঃ** জীবনশৈলী শিক্ষার কৌশল হিসাবে এটি একটি সহজ পদ্ধতি। কোনো পরিস্থিতি বা সমস্যাকে পরিকল্পিতভাবে বিবৃত করে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করতে পারলে তার সমাধান সহজতর হয়।

৭) **খেলাধূলা ঃ** খেলা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিনোদনমূলক ক্রিয়া। দলগত খেলা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। তাই কিছু কিছু উপযোগী বিষয় খেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য হতে পারে।

৮) **যৌন সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার সময় স্বচ্ছন্দতা ঃ** ব্যক্তকরণে জড়তাই শিক্ষার্থীদের কাছে যৌন বিষয়সমূহকে গোপনীয় ও আহরণে বাধা দান করে। এটি থেকে মুক্তি পাওয়া একমাত্র উপায় স্বচ্ছন্দতা।

৯) অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা সঠিক পরামর্শ দান।

১০) চিকিৎসা-নির্ভর বিষয়গুলিতে চিকিৎসকের পরামর্শ দানের ব্যবস্থা করা।

১১) সহপাঠ্যক্রমিক কাজ ও নানা অনুষ্ঠানে সহজভাবে মেলামেশার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যৌন জীবন সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান ও মনোভাব গড়ে তোলা।

সবশেষে বলা যায়, জীবনশৈলী শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কোনো একটি / একাধিক পদ্ধতি নেই। বিষয়বস্তু, পরিস্থিতি ও শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ভেদে শিক্ষককে সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন করে নিতে হয়।

৬.৭.৪ ঃ জীবন শৈলী শিক্ষার পাঠক্রম

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত মাধ্যমিক শিক্ষার জীবনশৈলীর পাঠক্রমটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত— (ক)ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য পাঠ্যসূচী, (খ) সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য পাঠ্যসূচী, (গ) নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য পাঠ্যসূচী।

ক) ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য পাঠ্যসূচী ঃ এই অংশে পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার্থীর আত্মসচেতনতা বিকাশমূলক বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ষষ্ঠ শ্রেণীর সূচিটি নিম্নরূপ ঃ—

১) **আমি ঃ** এই উপাংশে আত্ম উপলব্ধি, মূল্যবোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগরণমূলক কর্মসূচী - মূলত পোস্টার ও ছড়ার সাহায্যে শিক্ষা হবে।

২) **আমার স্থান ঃ** পরিবার ও সমাজে — এই উপাংশে আলোচনা ও চার্ট বা তালিকার সাহায্যে শিক্ষার্থীর নিজের পরিবার তথা পরিবেশে তার স্থান, বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদির ধারণা স্পষ্ট হবে।

৩) **আমার শরীর ঃ** এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থী মানব শরীরের মানচিত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন জৈবিক তন্ত্রগুলি সম্পর্কে ধারণা গঠন করে।

৪) **আমার বেড়ে ওঠা ঃ** এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থী তার শরীরের বিভিন্ন মাপের তাৎপর্য, পুষ্টি ও বৃদ্ধি, শরীর সুস্থ রাখার জন্য বিভিন্ন অঙ্গের যত্ন নেওয়ার পদ্ধতি, রোগ প্রতিরোধের উপায় ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণের সাহায্যে আলোচনার মাধ্যমে ধারণা গঠন হবে।

৫) **গল্প ঃ** 'ছুটি'— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গল্পটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের বয়সের একটি ছেলে ফটিকের কাহিনির মাধ্যমে তার পছন্দের পরিবেশেই সে যে স্বচ্ছন্দ এটা অনুধাবন করতে পারবে।

খ) সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য পাঠ্যসূচী ঃ—

এই অংশে শিক্ষার্থীর জীবদেহের সৃষ্টি , স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ও ভূমিকা এবং মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে। এই অংশের বিভিন্ন উপাংশগুলি হল—

১) **স্ত্রী ও পুরুষ এবং প্রাণের সৃষ্টি ঃ** জীব এবং মানুষের সৃষ্টির জন্য স্ত্রী ও পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারণা গঠন করবে।

২) **বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক বিকাশ ঃ** শরীরের মানচিত্রের রূপকল্পে শিক্ষার্থী মানুষের জন্মবৃত্তান্ত ও পরবর্তীকালে বৃদ্ধির অবস্থাগুলিকে জানবে। বিভিন্ন বয়সে উচ্চতা ও লিঙ্গভেদে একজন ব্যক্তির স্বাভাবিক ওজন সম্পর্কে তারা জানতে পারবে।

তাছাড়া, (ক) বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার্থীর বড়ো হয়ে ওঠা নিজেকে বুঝতে শেখা অনুধাবন করতে গিয়ে তারা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগজনিত পরিবর্তনগুলি উপলব্ধি করতে পারবে।

(খ) স্ত্রী-পুরুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়সহ সমগ্র দেহ সম্পর্কে শিক্ষর্থীরা সঠিকভাবে জানবে এবং বয়ঃসন্ধিকালের ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূর হবে।

(গ) তাদের মধ্যে নিদ্বির্ধায় বিভিন্ন প্রকার শারীরিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও সমস্যা সমাধানের মানসিকতা গড়ে উঠবে।

(ঘ) শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে।

৩) **বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক ও সামাজিক বিকাশ ঃ** কৈশোরের দৈহিক পরিবর্তনের সহগামী মানসিক পরিবর্তনগুলি এই বয়সের শিক্ষার্থীদের বিচলিত করে। আবেগগুলি বহিঃপ্রকাশে তীব্রতা দেখা যায়। সামাজিক আচরণে পরিবর্তন আসে। এগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অপরের সঙ্গে, বিশেষ করে বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক কীরূপ হলে সে সমাজে গৃহীত হবে এবং তার নিজেরও অসুবিধা সৃষ্টি হবে না, তা শিক্ষার্থীদের জানতে সাহায্য করা। নিজ চাহিদা পূরণ অন্যের পথে বাধা হলে, তা করা উচিত কিনা এও বোধ তার মধ্যে জন্মাবে।

গ) নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য পাঠ্যসূচী ঃ

মাধ্যমিক স্তরের উপান্তে জীবন শৈলীর পাঠ্যসূচীতে তাদের বড়ো হওয়া সম্পর্কে সচেতনতা আনার জন্য।

১) **বাড়ন্ত বয়স ঃ** তোমার দেহ, নজর রাখো এই উপাংশে (অ) কেমন করে বাড়ে তোমার দেহ? (আ) কেমন করে সুস্থ হবে দেহ? (ই) নেশা-সর্বনাশা শীর্ষক বিষয়গুলি প্রাধান্য পাবে।

২) **বাড়ন্ত বয়স ঃ** মনের জানালা খুলে রাখো — এই উপাংশে (অ) মনের গতি কোন পথে — আত্মনির্ভরতা, দায়িত্ববোধ, নেতৃত্ব দানের ইচ্ছা, আবেগপ্রবণতা, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণে অসামাজিক আচরণের খারাপ দিক ইত্যাদি প্রতিভাত করা হবে। (আ) পথের সাথির হাত ধরো — শিক্ষার্থীদের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কে ধারণা গঠন এবং তদানুযায়ী নিজস্ববোধ ও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন গুরুত্ব পাবে।

৩) **চেতনার রঙে রাঙাও সমাজ ঃ** এই অধ্যায়ে (অ) চাপের মুখে দাঁড়াও রুখে — মানসিক চাপকে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করে প্রবৃত্তিকে শাসন করা, মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে অন্যায় ও অমতের বিরুদ্ধে 'না' বলার অভ্যাস রপ্ত করা। (আ) যৌন সংসর্গে রোগ সংক্রমণ — যৌন মাধ্যমে সংক্রামিত বিভিন্ন রোগ যেমন — কী, কীভাবে এই রোগ সংক্রামিত হয়, এগুলির প্রতিরোধের উপায়, নানারকম যৌন রোগের ভয়াবহতা ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হবে। (ই) এসো কাঁধে কাঁধ মেলাই সামাজিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে আকস্মিক অসুস্থতা,দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিতে কাম্য আচরণ কী, সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী ও মহিলাদের প্রতি নিপীড়ন তথা বৈষম্যমূলক আচরণ ইত্যাদিতে কাম্য আচরণ কী, সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী ও মহিলাদের প্রতি নিপীড়ন তথা বৈষম্যমূলক আচরণ ইত্যাদির প্রতি কাম্য দৃষ্টিভঙ্গি কী তা জানতে সহায়তা করা। (ঈ) সংস্কার ও কুসংস্কার কোনটি সংস্কার এবং কোনটি কুসংস্কার তা জানতে ও বিবেচনা করতে পারবে। (উ) বাজারভোগ্য বস্তু সামগ্রীতে নিজের দৈনন্দিন জীবনে আবশ্যিকগুলিকে চিহ্নিত করবে, অনাবশ্যক উপাদানগুলিকে চিনতে পেরে তাদের ওপর নির্ভরতা কমাতে পারবে।

৪) **গল্প ঃ** 'সমাপ্তি'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর এই গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থী প্রকৃতির প্রতি প্রেম, প্রকৃতিকে খুঁটিনাটি কিভাবে দেখা উচিত ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তুলতে পারবে। অপরিণত মনের বিবাহ যে জীবনে সফলতা আনতে পারে না, তা জানতে পারবে।

৬.৭.৫ ঃ জীবন শৈলী শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা

জীবনশৈলী শিক্ষায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অনেকটাই শিক্ষার্থী বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়পাঠের মাধ্যমে অর্জন করলেও সেগুলির সমন্বয় ও প্রয়োজনীয় কিছু সংযোজনের অভাবে তা জীবনে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে না। তাই এই শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব হল —

১) শিক্ষকের নিজস্ব বিষয় যাই হোক না কেন, মানুষের জীবন যে অবিচ্ছিন্ন ও সমাজের অন্তর্ভূক্ত থেকে এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজনের মাধ্যমে সহাবস্থান করে, এ সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণা স্পষ্ট করতে হবে।

২) শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সম্পন্ন হতে হবে।

৩) জীবনশৈলী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর নিজের মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না।

৪) শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের সমস্যায় তিনি তাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করতে পারবেন।

৫) শিক্ষার্থীদের মনে তার সঙ্গে সম্পর্কে আস্থা অর্জনে ও প্রয়োজনে বন্ধুর মতো ব্যবহারে সক্ষম হবেন।

৬) নারী ও পুরুষের প্রতি শিক্ষক সমমনোভাবাসম্পন্ন ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে সক্ষম হবেন।

৭) শিক্ষার্থীদের মধ্যে যৌনতার নৈতিক ও সামাজিক দিক সম্পর্কে উপযুক্ত মনোভাব গড়ে তুলবেন।

৮) কৈশোরে যৌন বিকাশের ফলে অনেক সময় শিক্ষার্থীর মনে উদ্বেগ ও অপরাধবোধ দেখা যায়। এই অপরাধবোধ থেকে সমস্যার সৃষ্টি হয়। শিক্ষককে এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা ও পরামর্শদানের মাধ্যমে অপরাধবোধ ও ভয় দূর করার চেষ্টা করতে হয়।

৯) জীবনশৈলী শিক্ষার প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে শিক্ষককে অংশগ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ও করণীয় বিষয়গুলি জেনে নিতে হয়।

১০) শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য-সচেতন করবেন ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সু-অভ্যাস গঠনে সহায়তা করবেন।

১১) শিক্ষক কখনো নিজের মতামত শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেবেন না। তিনি সবসময় তাঁদেরকে সমস্যাটি বুঝতে দেবেন ও সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করবেন।

১২) শিক্ষার্থীদের পরিবার বা অভিভাবকদের সঙ্গে প্রয়োজনে শিক্ষক যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করবেন।

৬.৮ ঃ সারসংক্ষেপ (Summing up)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যাকে বলা হয় জনসংখ্যা, আর এই সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে — সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, স্বাস্থ্যবিষয়ক, শিক্ষাবিষয়ক, মানবিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ ইত্যাদির সচেতনতা জাগিয়ে তোলার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি-ই হল জনসংখ্যা শিক্ষা। জনসংখ্যা শিক্ষা আমাদের জনসংখ্যা ও শিক্ষার মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্ককে অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করতে সাহায্য করে।

জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। জনসংখ্যা শিক্ষা শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষেই সীমাবদ্ধ নয়, দেশের সমস্ত জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। আধুনিক বিশ্বে বিধিবদ্ধ শিক্ষাকালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই স্তরেই প্রাক-কৈশোর স্তর থেকে পরবর্তী কৈশোর পর্যন্ত শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে। এই স্তরের প্রধান উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং তাকে সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত করা। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর মন পরবর্তী শিক্ষাস্তর অপেক্ষা অনেক নমনীয় থাকে। সহজেই কোনো নতুন ধারণা বা মনোভাব তাদের মধ্যে সঞ্চার করা যায়। তাই জনসংখ্যা শিক্ষাও এই স্তর থেকে শুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রবেশের সময় যে শিক্ষার্থী তার বাল্যকালে থাকে, সেই শিক্ষার্থী এই স্তরে কৈশোরাবস্থা প্রায় অতিক্রম করে ফেলে। কৈশোরের শিক্ষায় এই বয়সের ছেলেমেয়েদের পরিবার ও সমাজে যথাযথভাবে জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলার জন্য সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়ের অনুশীলন প্রয়োজন। জীবনশৈলী শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যা মানুষকে সঠিকভাবে ও সকলের পক্ষে মঙ্গলদায়ক জীবন যাপন করতে শেখায়। জীবনশৈলী শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের চরিত্রে বিশেষ কয়েকটি গুন সঞ্চারিত করা যায় সমন্বয়ে সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব প্রকাশলাভ করতে পারে।

জীবনশৈলী শিক্ষার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অনেকটাই শিক্ষার্থী বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয় পাঠের মাধ্যমে অর্জন করলেও সেগুলির সমন্বয় ও প্রয়োজনীয় কিছু সংযোজনের অভাবে তা জীবনে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে না। তাই এই শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৬.৯ ঃ প্রশ্নাবলী (Questions)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা দিন।

২) জনসংখ্যা শিক্ষার ২টি উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন।

৩) জীবনশৈলী শিক্ষার সংজ্ঞা দিন।

৪) জনসংখ্যা শিক্ষার ২টি উপায় উল্লেখ করুন।

৫) জীবনশৈলী শিক্ষার শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) জনসংখ্যা শিক্ষার প্রকৃতি উল্লেখ করুন।

২) জীবনশৈলী শিক্ষার লক্ষ্য সংক্ষেপে লিখুন।

৩) মাধ্যমিকস্তরে জীবনশৈলী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৪) জনসংখ্যা কীভাবে আর্যসামাজিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে?

৫) জনসংখ্যা শিক্ষার জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১) জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২) জীবনশৈলী শিক্ষার শ্রেণীবিভাগগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩) মাধ্যমিকস্তরে জীবনশৈলী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা আলোচনা করুন।

৪) জীবনশৈলী শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

References :

1. Mondal Dilip Kumar - Population and Environmental Education

2. ড. দিলীপ কুমার মণ্ডল — জনসংখ্যা ও পরিবেশ শিক্ষা

3. শিক্ষার দার্শনিক ও সামাজিক ভিত্তি - ড. উজ্জ্বল কুমার পাণ্ডা
ড. মিহির চট্টোপাধ্যায়
ড. স্বপন সেন

একক - ৭

পরিবেশমূলক শিক্ষা

Environment Education

গঠন (Structure)

৭.১ সূচনা

৭.২ উদ্দেশ্য

৭.৩ পরিবেশের সংজ্ঞা ও ধারণা

৭.৪ পরিবেশ শিক্ষার পরিধি

  ৭.৪.১ পরিবেশ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

  ৭.৪.২ পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার মধ্যে পার্থক্য

৭.৫ পরিবেশমূলক শিক্ষার উপায়

৭.৬ মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

৭.৭ পরিবেশ সংরক্ষণ

  ৭.৭.১ উদ্ভিদ সংরক্ষণ

    ৭.৭.১.১. In- Situ সংরক্ষণ

    ৭.৭.১.২. Ex - Situ সংরক্ষণ

  ৭.৭.২ 'সংরক্ষিত জীবমণ্ডলের' মণ্ডলকরণের নকশা

৭.৮ সারসংক্ষেপ

৭.৯ প্রশ্নাবলী

৭.১ ঃ সূচনা (Introduction)

পরিবেশ শিক্ষার কোন সর্বজনীন গৃহীত সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তবে পরিবেশ শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গেলে সর্বপ্রথম জানা দরকার পরিবেশ কাকে বলে? বটকিন ও কেলার বলেন, 'জীব বা উদ্ভিদ বা প্রাণী তাদের জীবন চক্রের যেকোনো সময়ে যে সমস্ত জৈব এবং অজৈব কারনগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেই কারনগুলির সমষ্টিকে পরিবেশ বলে। (United Nations Environment Programme 1976) বলে। 'পরিবেশ বলতে পরস্পর ক্রিয়াশীল উপাদানগুলির মাধ্যমে গড়ে ওঠা সেই প্রাকৃতিক ও জীবমণ্ডলীর প্রণালীকে বোঝায় যার মধ্যে মানুষ ও অন্যান্য সজীব উপাদানগুলি বেঁচে থাকে, বসবাস করে।' পরিবেশের এই সংজ্ঞাগুলি থেকে আমরা বলতে পারি, যে শিক্ষার মাধ্যমে জীব সম্প্রদায়ের পারিপার্শ্বিক জৈব এবং প্রাকৃতিক অবস্থাকে সুন্দরভাবে অটুট রাখার জন্য মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে নিরলস প্রয়োগ চলেছে তাকে পরিবেশ শিক্ষা বলে। পরিবেশ শিক্ষা হল প্রকৃতি ও মনুষ্য সৃষ্টি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলির ধারাবাহিক বিশ্লেষণ।

৭.২ ঃ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায় পড়ার পর শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্পর্কে সচেতন হবে -

ক) সমগ্র পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যক্তির সচেতনতা বৃদ্ধি।

খ) সমগ্র পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যক্তির মধ্যে সচেতনতা তৈরী করা।

গ) পরিবেশ রক্ষায় ব্যক্তির উপযুক্ত দায়বদ্ধতা।

ঘ) সমগ্র পরিবেশ ও সেই সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধানে সচেতনতা ব্যক্তির মধ্যে জাগ্রত করা।

ঙ) প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করা।

৭.৩ ঃ পরিবেশের সংজ্ঞা ও ধারণা

সাধারণ অর্থে, বিশ্ব প্রকৃতির যে অংশ দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত তাকে পরিবেশ বলে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে যে সব উদ্দীপক সক্রিয় রাখে, তার সমবায়ই হল পরিবেশ। অর্থাৎ প্রকৃতির সমস্ত দান-পাহাড়, পর্বত, নদী, বন-জঙ্গল, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু, মাটি, জলবায়ু ইত্যাদি এবং কলকারখানা, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দোকান-বাজার, সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার ইত্যাদি মনুষ্যসৃষ্ট সমস্ত উপাদান যা ব্যক্তিকে তার জীবনকালের মধ্যে সক্রিয় রাখে, তার সমবায়কেই পরিবেশ বলা হয়।

Concise Oxford Dictionary এর মতে পরিবেশ হল উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বহিরঙ্গের অবস্থাগুলির সমষ্টি। এখানে বহিরঙ্গের অবস্থা হল চারপাশের অবস্থা। উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ চারপাশের যে অবস্থার মধ্যে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে, সেই জৈব ও অজৈব কারণের সমাহার পরিবেশ।

পরিবেশের ধারণা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। পরিবেশের প্রভাব ব্যক্তিজীবনে সীমাহীন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। কোনো বিশেষ বস্তু বা বস্তু নিয়ে একজনকে উত্তেজিত করলেও অন্য একজনের কাছে তা সাড়া আদায় নাও করতে পারে। এক্ষেত্রে উক্ত বা বস্তু নিয়ে প্রথমজনের পরিবেশের অংশ হলেও দ্বিতীয় জনের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এছাড়া, পরিবেশ কথাটি অন্য অর্থেও ব্যবহার করা হয়। এই অর্থে, পরিবেশ সেই সমস্ত প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা যা মানুষকে যে-কোনো জায়গায়, যে-কোনো সময়ে প্রভাবিত করে। যেমন-দ্রব্যমূল্য বাড়লে মানুষের কষ্ট বাড়ে, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মানুষকে উদ্বিগ্ন করে ইত্যাদি। নিম্নে বিভিন্ন পরিবেশবিদদের দেওয়া দু-একটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হল :

i) বাটকিন এবং কেলার (1995) বলেন, ‘‘জীব, উদ্ভিদ বা প্রাণী তাদের জীবনচক্রের যে-কোনো সময়ে যে সমস্ত জৈব এবং অজৈব কারণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেই কারণগুলির সমষ্টিকে পরিবেশ বলে।’’

ii) আর্মস (1994) বলেন, ‘‘জীবন সম্প্রদায়ের পারিপার্শ্বিক জৈব এবং প্রাকৃতিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে।’’

iii) ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (1995) বলে, ‘‘পরিবেশ বলতে পরস্পর ক্রিয়াশীল উপাদানগুলির মাধ্যমে গড়ে ওঠা সেই প্রাকৃতিক ও জীবমণ্ডলীয় প্রণালীকে বোঝায় যার মাধ্যমে মানুষ ও অন্যান্য সজীব উপাদানগুলি বেঁচে থাকে, বসবাস করে।’’

উপরিউক্ত এই সংজ্ঞাগুলি থেকে পরিবেশের যে সংজ্ঞা দেওয়া যায় তা হল, ‘‘উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহ অর্থাৎ জল, মাটি প্রভৃতি দরকার হয় তাকে পরিবেশ বলে।’’

পরিবেশের এই সংজ্ঞাগুলি থেকে আমরা বলতে পারি, যে শিক্ষার মাধ্যমে জীব সম্প্রদায়ের পারিপার্শ্বিক জৈব এবং প্রাকৃতিক অবস্থাকে সুন্দরভাবে অটুট রাখার জন্য মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে নিরলস প্রয়োগ চলেছে তাকে পরিবেশ শিক্ষা বলে।

পরিবেশ শিক্ষা হল প্রকৃতি ও মনুষ্যসৃষ্ট পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলির ধারাবাহিক বিশ্লেষণ। (Environmental studies pretain to a systematic analysis of the natural and man-made world encompasing various scientific, economic, social and athical aspects.)

৭.৪ ঃ পরিবেশ শিক্ষার পরিধি (Scope of Environmental Education)

যে সকল বিষয় পরিবেশ শিক্ষার মধ্যে পড়ে সেগুলি হল —

i) পরিবেশ ও তার উপাদানসমূহ (Environment and its elements)

পরিবেশের উপাদানগুলি দুই শ্রেণীর।

1) জৈব উপাদান — যার জীবন আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। যেমন - গাছপালা, জীবজন্তু, ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, মানুষ ইত্যাদি।

2) অজৈব বা জড় উপাদান — যার মধ্যে জীবনের লক্ষণ প্রকট নয়। যেমন—জল, বায়ুমণ্ডল, আলো, মাটি, উষ্ণতা, আদ্রতা ইত্যাদি।

i) বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)
ii) জনসংখ্যা এবং পরিবেশ (Population and Environment)
iii) জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)
iv) পরিবেশ দূষণ ও নিয়ন্ত্রণ (Environment polution & control)
v) পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য (Environment and public health)
vi) উন্নয়নমুখী কর্ম ও পরিবেশের ওপর তাদের প্রভাব (Development work and their effects on Environment)
vii) পরিবেশ নীতি (Environment policy)
viii) পরিবেশ আইন (Environment Laws)

পরিবেশ শিক্ষা পরিবেশ ও তার সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে ও পরিবেশের সমস্যা নিবারণ ও সমাধানের জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা, জ্ঞান ও মনোভাব তৈরী করার শিক্ষা দেয়। যে যে ক্ষেত্রগুলোতে ‘পরিবেশ শিক্ষা’ কাজ করে সেই সব ক্ষেত্রগুলোকে তার কর্মপরিধি জুড়ে থাকে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে পরিবেশ শিক্ষা কাজ করে থাকে।

ক) **জনসংখ্যার পরিমান বৃদ্ধি ও বৃদ্ধির হার** — জনসংখ্যার আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে পরিবেশগত সমস্যার একটি সদর্থক সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তেই জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হলে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। কারণ, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অতিরিক্ত শোষণ হয়। একইভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানের উপর প্রভাব ফেলে। কারণ, ভুসম্পত্তি বা অন্যান্য সম্পদ বৃদ্ধি করা যায় না। এখানে আমরা বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার একটি তালিকার সাহায্যে দেখাতে পারি।

খ) **দূষণ** — বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ যথা, স্থলদূষণ, জলদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ ও তাদের ক্ষতিকারক প্রভাব পরিবেশকে ক্রমশঃ অবনমিত করছে; যে সমস্ত প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলো থেকে বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে এবং সর্বোপরি যেগুলো মানব জীবনের সুস্থতাকে ব্যাহত করছে—এ সবই পরিবেশ শিক্ষার আলোচ্য বিষয়। পরিবেশ শিক্ষায় দূষণের বিভিন্ন কারণগুলো ও তার প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

গ) **জনস্বাস্থ্য ও জীবনের মান** — জনস্বাস্থ্য ও জীবনের মান পরিবেশ দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। জিনগত ব্যাপার ছাড়াও পরিবেশগত নানান প্রভাবে মানুষের শরীরে রোগ ব্যাধি সৃষ্টি হয় - যেমন জল সরবরাহ, উন্নত শহুরে পরিবেশ, জলবায়ু ও বিভিন্ন প্রকার মানুষের সংস্পর্শ ইত্যাদি।

ঘ) **মানুষের জীবনে মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনশৈলী** — বর্তমান যুগে অধিকাংশ পরিবেশগত সমস্যাই মানুষের সৃষ্টি। সুতরাং মানুষের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধই পরিবেশকে প্রকৃত রূপ দিতে পারে বা বদলে দিতে পারে। সুতরাং মানবিক নীতিবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, বাস্তুতন্ত্র, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও কারিগরী দিকের বিশ্লেষণ-এ সব কিছুই পরিবেশ শিক্ষার আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে।

ঙ) **আইন** — প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণের জন্য মানুষের মধ্যে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা বা চর্চা করা আজকাল কঠিন হয়ে পড়েছে। সুতরাং পরিবেশ সম্পর্কিত আইন তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরকম কড়া আইন তৈরী করা দরকার যাতে মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদকে নষ্ট করতে না পারে। এই জন্যই পরিবেশ সংরক্ষণ আইনও এই বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ) **সম্পদ** — পরিবেশ শিক্ষা বিভিন্ন প্রকার সম্পদের উৎস যেমন - তেল, কয়লা, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের গুনগত ও পরিমানগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে সেইসব প্রক্রিয়াগুলো, সম্পদের মান খারাপ হয়ে যাওয়ার সমস্যাসমূহ, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের বিভিন্ন রীতি পদ্ধতিসমূহ, পরিবেশের অবক্ষয়ের প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন পন্থা যেমন, জমির অবক্ষয়রোধ, পর্যায়ক্রমে শস্য ফলানো পদ্ধতি, বনসৃজন, বিকল্প শক্তি সম্পদের ব্যবহার- যেমন, সৌরশক্তি, জোয়ারভাটার শক্তি, বায়ুশক্তি ইত্যাদি এইসব নিয়ে আলোচনা করা।

ছ) **পরিবেশ ও তার উপাদান** — প্রাকৃতিক পরিবেশ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন, বিকাশের বিভিন্ন উপাদানগুলির পরস্পর নির্ভরশীলতা এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিকাশ এবং প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ - এ সব কিছুই পরিবেশ শিক্ষার আলোচ্য বিষয়। পরিবেশ শিক্ষা প্রাকৃতিক বা জীবভৌতিক পরিবেশ ও মানুষের সৃষ্টি পরিবেশ উভয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় উদ্ভিদ, প্রাণী এবং বিভিন্ন জীব, সেই এলাকার জল, বায়ু, মাটিতে কিভাবে একটি বাস্তুতন্ত্র গঠন করে পরিবেশ শিক্ষায় তা আলোচনা করা হয়।

জ) **প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সনাক্তকরণ** — স্থিতিশীল বিকাশের জন্য পরিবেশের সম্পদের কার্যকরী ব্যবহারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সংরক্ষণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানানোর জন্য বিভিন্ন প্রচলিত প্রথাগত (বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি) ও অপ্রচলিত প্রথাগত (সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা, বেতার, দূরদর্শন, ইন্টারনেট ইত্যাদি) শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তদুপরি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকরী নীতি, আইন প্রণয়ন ও প্রকল্প গ্রহণ, যেমন, পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ, পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্যের সঠিক যোগাযোগ, পরিবেশের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্বশীল আচরণ, সম্পদের ব্যবহার ইত্যাদির উপর পরিবেশ শিক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, পরিবেশ শিক্ষা আমাদের স্মরণ করায় যে আমাদের গ্রহ পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। সুতরাং পরিবেশের প্রতি আমাদের একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নতি ঘটাতে হবে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর অপব্যবহার না করে বা ধ্বংস না করে বা জীববৈচিত্র্যের বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট না করে প্রকৃতির সাথে বাস করার চেষ্টা করতে হবে।

1) **প্রাকৃতিক পরিবেশ** — পৃথিবীর সব ধরনের জড় ও জীবের সমাহার। জলবায়ু, মাটি, আলো, গাছপালা, জীবজন্তু সব নিয়েই প্রাকৃতিক পরিবেশ। জড় প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান — ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। জীব প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান — ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়া, উদ্ভিদ জগৎ, প্রাণকুল। প্রাকৃতিক পরিবেশের বয়স পৃথিবীর সমান।

2) **সামাজিক পরিবেশ** — সতত পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশ মানুষের সৃষ্টি। মানুষের রীতিনীতি, শিক্ষা, মূল্যবোধ ইত্যাদি সব কিছুর সমষ্টি হল সামাজিক পরিবেশ। এই পরিবেশের মূল উপাদান হল সংস্কৃতি বা Culture । সামাজিক পরিবেশের বয়স, প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনায় অনেক কম। পৃথিবীতে মানুষ আবির্ভাবের পরে ধীরে ধীরে এই পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবেশমূলক শিক্ষা হল পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতা বিকাশের সেই সমস্ত সংগঠিত সক্রিয়তা, যেগুলির দ্বারা মানুষ তার আচরণ ধারাকে নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠিত করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বাস্তুতন্ত্রগুলির সাম্যবস্থা ফিরিয়ে এনে স্থায়ীভাবে বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের কাম্য স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

অন্যভাবে বলা যায় যে, পরিবেশমূলক শিক্ষা একটি শিখন প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তির মধ্যে তার পরিবেশের সম্পর্কে জ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে, সেই বিপদের মোকাবিলা করার মতো প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও দক্ষতা, উপযুক্ত মনোভাব ও প্রেরণা সৃষ্টি করে, তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও দায়িত্বশীল কর্ম সম্পাদনের যোগ্য করে গড়ে তোলে। (UNESCO, Tbilisi Declaration, 1978)

পরিবেশ শিক্ষার লক্ষ্য হবে স্বচ্ছ ও বিস্তারিত। এর মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ —

1) **সমগ্র পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যক্তির সচেতনতা বৃদ্ধি করা:** ব্যক্তি সঙ্গে তার পরিবেশ যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং পরিবেশের সাম্যবস্থা নষ্ট করা হলে তার ক্ষতি, এই ধারণা শিক্ষার্থীর মধ্যে নিয়ে আসা।

2) **বাস্তুতন্ত্রের নীতিগুলি সম্পর্কে ব্যক্তির মধ্যে বোধগম্যতার বিকাশ সাধন করা:** এই পৃথিবীতে প্রাকৃতিক নিয়মেই গড়ে উঠেছে অসংখ্য বাস্তুতন্ত্র, সেগুলির মধ্যে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব উপাদান পারস্পরিক সহযোগীতা ও সহবস্থানে বেঁচে আছে। এগুলির স্বাভাবিক উপাদান থেকে পরিবেশের স্বাভাবিকিত্ব সূচিত করে। যেকোনো এক বা একাধিক উপাদানের মাত্রাহীনতা কম-বেশী বাস্তুতন্ত্রটির সাম্যবস্থা বিঘ্নিত করার মাধ্যমে সমগ্র পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। তাই এই বাস্তুতন্ত্রগুলির গড়ে ওঠা ও বজায় থাকার নীতিগুলি সম্পর্কে ব্যক্তির মধ্যে অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে বোধগম্যতা নিয়ে আসা।

3) **সমগ্র পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যক্তির মধ্যে সচেতনতা তৈরী করানো:** পরিবেশের বিভিন্ন অজৈব ও জৈব উপাদানগুলির প্রতিটিই পরিবেশের অচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং প্রতিটি নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্দিষ্ট স্থানে থাকায় পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। এগুলির প্রতিটির প্রয়োজন আছে এবং স্বাভাবিক ব্যবহারে কোনো ক্ষতি হয় না। এই উপাদানগুলির কোনো কোনোটি পুনর্নবীকরণযোগ্য আবার কোনোটি পুনর্নবীকরণযোগ্য নয়। অপুনর্নবীকরণযোগ্য উপাদানের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে তার পরিমাণ কমে আসে ও তা মানবসভ্যতার পক্ষে সঙ্কটজনক হয়। যেমন --- জীবাশ্ম জ্বালানী কয়লা ও পেট্রোলিয়াম। আবার কোনো উপাদান আছে, যা পুনর্নবীকরণযোগ্য হলেও তার সঠিক ব্যবহার ছাড়া সংকট হতে পারে। যেমন ভুগর্ভস্থ জল, তার পরিমাণ ও শুদ্ধতা ইত্যাদি।

4) **সমগ্র পরিবেশ ও সেই সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধানের সচেতনতা ব্যক্তির মধ্যে জাগরিত করা:** সমগ্র পরিবেশে বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমস্যাগুলি আপাতভাবে ব্যক্তিবিশেষের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলছে না কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই তা ক্ষতিকারক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। অথবা, কোনও বিরূপ পরিস্থিতি তৈরী হলে, কেন তা হচ্ছে, জানা না থাকায় ব্যক্তি বুঝতে পারছে না। যেমন-ওজোনস্তর লঘুকরণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন, ভূগর্ভস্থ জলস্তরের ক্রমাবনতি ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা জরুরী ভিত্তিতে জাগ্রত করা।

5) **পরিবেশ রক্ষায় ব্যক্তির উপযুক্ত দায়বদ্ধতা অনুপ্রেরিত করা:** এটা সাধারণ ঘটনা যে, আমরা যারা পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে বা আংশিকভাবে জ্ঞাত, তারা এটি জেনে সাধারণভাবে উদ্বিগ্ন হই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সমস্যা নিরসনে আমারও ভূমিকা ও দায়বদ্ধতা আছে, ততটা সচেতন থাকি না। অথচ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমস্যা তৈরীতে বা বৃদ্ধিতে নিজেদেরও ভূমিকা থাকে। যেমন—সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গতি বাড়াতে রাস্তায় আজ যন্ত্রযানের ভীড়, যেগুলি সচল রাখার জন্য একদিকে অপুনর্নবীকরণযোগ্য বহুমূল্য জীবাশ্ম জ্বালানী ক্ষয় হচ্ছে, অপরদিকে তেমনি বায়ুমণ্ডলে দূষিত কার্বন-ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সিসা প্রভৃতির পরিমাণ আশঙ্কাজনক পরিমাণে বাড়ছে। আমরা এটা জানি না তা নয়, কিন্তু উপযুক্ত দায়বদ্ধতার অভাব আমাদের নিবৃত্ত রাখছে। এ বিষয়ে যথাযথ দায়বদ্ধতার অনুপ্রেরণা একান্ত জরুরী ভিত্তিতে ব্যক্তি মনে সঞ্চার করা পরিবেশমূলক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

6) **প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সক্রিয়তা আনয়নের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করা:** প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রায় দেশের ভূগর্ভে, ভূপৃষ্ঠে ও বায়ুমণ্ডলে অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার নিহিত। কিন্তু মানবসভ্যতার চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে এই অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার ক্ষয়িষ্ণুমান। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, এই শতকের মধ্যভাগেই আমরা বহু প্রয়োজনীয় সম্পদকে প্রায় অবলুপ্তির তালিকায় তুলে ফেলব। তাহলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাঁচবে কী করে? এগোবে কী করে? তাই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ — জল, বায়ু, খনিজ, জীবাশ্ম-জ্বালানী ইত্যাদির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের পন্থা ও পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেগুলিকে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সক্রিয়তার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা পরিবেশমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৭.৪.১.ঃ পরিবেশ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Environmental Education)

পরিবেশ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল সাধারণ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অংশবিশেষ মাত্র। যার সংজ্ঞা বিভিন্ন দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদরা বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে বেশীরভাগই হার্বার্ট স্পেন্সারের সঙ্গে একমত। তাঁর মতে — " Education should prepare for complete living which does not mean living in the material sense, nearly but in the widest sense." পরিবেশ শিক্ষার অপর একটি লক্ষ্য হল দায়িত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের উন্নতি সাধন করা যার মাধ্যমে পরিবেশ ও তার উপাদানগুলিকে নিরাপদ রাখা, তার সংরক্ষণ করা ও উন্নতিবিধান করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। এই জন্য National Strategy of Environmental Education অনুসারে পরিবেশ শিক্ষার তিনটি ধারা উল্লেখযোগ্য—

১) **পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষা (About the environment)** — প্রথম ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞানমূলক ও বোধমূলক ধারণা দিতে হবে। পরিবেশ ও পরিবেশ সম্পর্কিত ঘটনা এবং বিভিন্ন ধরনের কাজও মানুষ এবং তার পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে ঘটে থাকে।

২) **পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষা (Through the environment)** — দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরিবেশকে বাহন করে শিক্ষার্থীরা কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে ধারণা, বোধ ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। এটি অভিজ্ঞতা নির্ভর এবং সক্রিয়তাভিত্তিক। শ্রেণীকক্ষের বাইরে পরিবেশের মধ্যে নিজ পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ, দক্ষতালাভ ইত্যাদির শিক্ষা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, ক্যাম্পিং ট্রেকিং ইত্যাদি পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক দক্ষতা ও অভিযানের সাহস যোগায়।

৩) **পরিবেশের জন্য শিক্ষা (For the environment)** — তৃতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মনোভাব, দক্ষতা ও মূল্যায়ন ক্ষমতারও উন্নতি সাধন করা যায় পরিবেশের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। এটি পরিবেশের উন্নতির জন্য বিস্তৃত পদক্ষেপ। মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে দায়িত্বশীল নাগরিক করে তোলা যাতে পরিবেশের উন্নতিতে সে সক্রিয় অংশ নিতে পারে।

৭.৪.২ পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Environmental Education and Environmental Awareness)

পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ।

১) পরিবেশ শিক্ষা হল জীবন সম্পর্কে উন্নত ধারণা প্রদানের ব্যবস্থা, পরিবেশ সচেতনতা পরিবেশের ভৌত ও যৌথ উপাদানগুলি সম্পর্কে মানুষকে অবগত করে।

২) পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে মানুষের যৌথ, জৈবিক, সাংস্কৃতিক ও মনোবৈজ্ঞানিক পরিবেশের সম্পর্ক যুক্ত, অপরপক্ষে পরিবেশ সচেতনতা প্রাকৃতিক, জৈবিক ও ভৌত পরিবেশের ধারণা প্রদানের পদ্ধতি মাত্র।

৩) জীবনের মানোন্নয়ন, মূল্যবোধ ইত্যাদির বিকাশ ঘটাতে পরিবেশ শিক্ষা প্রধান কার্যকরী ও উৎপাদনধর্মী ভূমিকা পালন করে থাকে। অপরপক্ষে, পরিবেশ সচেতনতা পরিবেশের ভৌত ও জৈব উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্ক এবং তাদের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করে থাকে।

৪) পরিবেশ শিক্ষার মধ্যে মানুষের ভৌত, জৈবিক, সাংস্কৃতিক ও মনোবৈজ্ঞানিক পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত। এটি মানুষের তথা সামগ্রিকভাবে জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ও পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন। অপরপক্ষে, সময়কাল, স্থান, পার্থিব জগৎ ও মানবিক দিককে শনাক্ত করতে, পরিবেশের বিভিন্ন জীবের ভৌত, প্রাকৃতিক ও জৈবিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে পরিবেশ সচেতনতা তথ্য সরবরাহ করে।

৫) পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ও মনোগত পরিবেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কোন সংস্থার পরিবেশ ও সমৃদ্ধি, সংস্থার মনোবৈজ্ঞানিক নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং একইভাবে শ্রেণীকক্ষের সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক পরিবেশেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের মানসিকতা দ্বারা রচিত হয়। পক্ষান্তরে, পরিবেশ সচেতনতা বিষয়টি জীবের ভৌত ও জৈবিক উপাদান এবং বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক বা বোঝাপড়া সম্পর্কে জ্ঞান সরবরাহ করে।

৬) পরিবেশ শিক্ষা মানুষের কাঙ্খিত পরিবর্তনগুলির জন্য সহায়ক পরিবেশের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। অপরপক্ষে, পরিবেশ সচেতনতা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মনুষ্য-পরিবর্তিত পরিবেশ সম্পর্কে শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান সরবরাহ করে।

৭) পরিবেশ শিক্ষা সমগ্র স্তরে পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের জন্য কর্মপন্থা ও কর্মোদ্যোগ পালনের নিমিত্ত সুযোগ প্রদান করে থাকে। পক্ষান্তরে, পরিবেশ সচেতনতা পরিবেশ সমস্যা ও তার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সীমাবদ্ধ। এখানে সমাধানের জন্য কোন কর্মপন্থা বা কর্মোদ্যোগ গৃহীত হয় না।

৮) পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রেণীকক্ষের মধ্যে আন্তঃবিনিময় ঘটায়। এই ধরনের আন্তঃবিনিময়ের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা কার্যকরী হয়ে ওঠে।

৯) পরিবেশ শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় প্রকার প্রয়োগ সম্ভব, কিন্তু পরিবেশ সচেতনতার শুধু তাত্ত্বিক প্রয়োগ সম্ভব।

৭.৫ঃ পরিবেশমূলক শিক্ষার উপায়

মানব প্রজাতির দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বের জন্য পৃথিবীর জীবনধারক পরিবেশের স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণ আবশ্যক। এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি সর্বসাধারণের জন্যই প্রয়োজন। প্রথাগত শিক্ষায় প্রথম থেকেই পরিবেশমূলক শিক্ষার পাঠ শুরু করা যেতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার জন্য ও শিক্ষার্থীদের বয়সস্তর উপযুক্ত হওয়ার কারণে এই স্তরে পরিবেশমূলক শিক্ষা সুপরিকল্পিতভাবে দেওয়া যেতে পারে। এর জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যেতে পারে।

i) **প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির উপায় (Way to increasing Environmental Awareness through Formal Education):**

প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে নিম্নলিখিত উপায়ে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। যথা —

- i) বিদ্যালয় স্তর থেকে পরিবেশ শিক্ষা (Environmental Education from school stage to onwards) চালু করা।
- ii) পরিবেশের উপর প্রশংসামূলক পাঠদান (Environmental Appreciation Courses) করা।
- iii) ব্যবস্থাপনা ও কারবারী জগতে পরিবেশ বিষয়ে ধারণা দেওয়া (Environmental Concepts in Management and Business Studies).

ii) প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির উপায় (Way to increasing Environmental Awareness through Non-Formal Education) :

প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যমে নিম্নলিখিতভাবে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। যথা-

- i) জাতীয় স্তরে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতার উদ্দেশ্যে প্রচার অভিযান (National Environmental Awareness Campaign)
- ii) বাস্তু সংঘের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি (Increasing Environmental Awareness through Eco-clubs).
- iii) পরিবেশ সচেতনতার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী শিখন ও পর্যবেক্ষণ কর্মসূচী (Global learning and observations to benefit the Environment).

পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার উপরিউক্ত উপাদানগুলি যথাযথ বিবেচনা করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। যথা—

- **a) পরিবেশের উপাদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (Increasing Environmental Awareness on elements of Environment) :** পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান কী কী এবং একটির সম্পর্কে অপরটির পারস্পরিক সম্পর্ক কী সে সম্পর্কে সকলকে অবগত করা।
- **b) পরিবেশ দূষণ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শিক্ষা (Increasing Environmental Awareness on elements of Environment) :** পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করার জন্য পরিবেশ পাঠ খুবই জরুরী। পরিবেশ দূষণের কারণ, বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ। যেমন — বায়ুদূষণ, জলদূষণ, শব্দদূষণ ইত্যাদির উৎপত্তি ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জানার জন্য পরিবেশ পাঠ প্রয়োজন।
- **c) পরিবেশের উৎস ও তার সদব্যবহার সম্পর্কে ধারণা (Creation of conception regarding the source of environment and their utilisation) :** পরিবেশের উৎস বা উপাদানগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া এবং সেগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে পরিবেশ পাঠ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

d) **জনসংখ্যা নীতি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন (Acquiring Knowledge regarding population policy and population control) :** জনসংখ্যা নীতি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করার জন্য পরিবেশ পাঠ বিশেষ দরকার।

e) **অর্থনৈতিক প্রগতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন (Acquiring Knowledge regarding Economic Progress) :** পরিবেশের উপাদানগুলিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করেছে তা জানার জন্য পরিবেশ পাঠ দরকার। পরিবেশ পাঠের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক প্রগতির গতি প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়।

f) **জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন (Acquiring Knowledge about Public health) :** পরিবেশ পাঠের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের মান মন কেমন এবং কীভাবে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটানো যায় সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়।

g) **বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি (Creation of idea regarding Ecosystem) :** বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা সৃষ্টি করার জন্য পরিবেশ পাঠ প্রয়োজন। পরিবেশ পাঠের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টির জোগান, শক্তির প্রবাহ, বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়।

h) **পরিবেশ আইন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন (Acquiring comprehensive knowledge about Environment law) :** পরিবেশকে দুষণ থেকে রক্ষা করার জন্য যেসব আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেগুলো প্রয়োগ করে যারা পরিবেশ-এর ক্ষতিসাধন করে তাদের কী কী শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য পরিবেশ পাঠ একান্ত প্রয়োজন।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ফলে দেখা যাচ্ছে যে, পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হলে প্রথাগত এবং প্রথাবহির্ভূত উভয় শিক্ষারই প্রয়োজন। উভয় শিক্ষার মেলবন্ধনে যথাযথ পরিবেশ সচেতনতা শিক্ষার্থী তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগ্রত করা সম্ভব।

৭.৬ঃ মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

সাড়ে তিনশো কোটি বৎসরের প্রাচীন এই পৃথিবীতে জীবজগৎ সৃষ্টির সবার পরে এসেছে মানুষ। প্রায় দশ লক্ষ বৎসর আগে মানুষ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে। আজ থেকে একশো-দেড়শো বৎসর আগে পর্যন্ত সে পরিবেশের অন্যান্য জীব ও জড় উপাদানের সঙ্গে মিলেমিশে তাল মিলিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখেছিল। প্রাকৃতিক নিয়মে, সৃষ্ট জীববৈচিত্র্যে ভরপুর আমাদের এই পৃথিবীতে সবাই তাদের বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হত। কিন্তু তারপর সভ্যতার, বিশেষত যন্ত্র সভ্যতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে, মানুষ আজ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মকে উপেক্ষা করে নিজেকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে সবার সঙ্গে নিজেকেই বিপন্ন করে তুলছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে, অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আবার অনেকেই বিলুপ্তির পথে। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মে, পরিবেশের উপাদানগুলি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বাস্তুতন্ত্র তৈরী করে বসবাস করত। সেই বাসগৃহ বিনষ্ট হওয়ায় আমাদের অস্তিত্বও আজ সংকটাপন্ন।

এমতাবস্থায়, সমস্ত রকম জ্ঞান ও কৌশল মানুষের আয়ত্ত করার আগে দাবি জানাচ্ছে পরিবেশ রক্ষার পাঠ, যা সঠিকভাবে নিতে না পারলে, পৃথিবীর অস্তিত্বই সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে। আমরা কেউ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারব না। বিপদের গভীরতা উপলব্ধি করেই আমাদের দেশের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট শিক্ষার সর্বস্তরে পরিবেশমূলক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে, মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষায় পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করা হল —

১) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর পরিণমন প্রাথমিক স্তরের থেকে বেশী। এই স্তরে আত্মবোধ (Self concept) জাগরিত হওয়ায় তারা নিজের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারে। তাই এই স্তরে বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিবেশমূলক শিক্ষা তারা গ্রহণে সমর্থ।

২) দীর্ঘ চর্চায় ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলির আয়ত্তীকরণ এই স্তরে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়গুলি অর্জনের সক্ষমতা তৈরী করে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক, পুনর্নবীকরণযোগ্য ও অযোগ্য শক্তির উৎস, জল, কার্বন ও অক্সিজেন চক্র ইত্যাদি বিষয়গুলি আয়ত্ত করা তাদের পক্ষে সহজ হয়, তাই এই স্তরে পরিবেশমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে।

৩) বিজ্ঞানের মূল নীতিগুলির সঙ্গে পরিচিতি এই স্তরে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ দূষণ, ওজনস্তর লঘুকরণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন, গ্রিনহাউস প্রভাব, আবহাওয়ার অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন ইত্যাদির আয়ত্তীকরণ সক্ষম করে।

৪) জনসংখ্যার একটি বড় অংশ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী। তাদের মন কোমল ও পরোপকার প্রবণতাযুক্ত। তাই পরিবেশমূলক শিক্ষায় এই স্তরের শিক্ষার্থীরা শিক্ষিত হলে, জনসাধারণের মধ্যে এই বিষয় সচেতনতা সৃষ্টি সহজতর হবে।

৫) পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের অসংযত ব্যবহারের ফলেই যে আজকের এই বিপর্যয়কারী অবস্থা, তা নাগরিক জীবনে প্রবেশোন্মুখ এই স্তরের শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করলে, ভবিষ্যত ব্যবহার সংযত হওয়ার সম্ভাবনা। জীবাশ্ম জ্বালানীর ভাণ্ডার সীমায়িত, অথচ তার ব্যবহারে রাশ না টেনে প্রতি বৎসর তার গুণোত্তর প্রগতিতে বৃদ্ধি হওয়ায় অল্প সময়ে তা নিঃশেষিত হতে পারে এই সচেতনতা প্রয়োজনীয়।

৬) নিজেদের সুবিধার জন্য মানুষ নিজে পরিবেশের কতটা ক্ষতি করে, তা জানলে সে অন্তত নিবৃত্ত হওয়ার চেষ্টা করবে। নবীন শিক্ষার্থীদের এই স্তরে তাই পরিবেশমূলক শিক্ষা প্রয়োজনীয়।

৭) এই পৃথিবীকে আগামী প্রজন্মের বাসযোগ্য করার দায়িত্ব আমাদের এই বোধ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য পরিবেশমূলক শিক্ষা এই স্তরে প্রয়োজনীয়।

৭.৭ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ

বিজ্ঞানী অডাম (Odum) মন্তব্য করেছিলেন একজন সংরক্ষণবিদের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য থাকা উচিত -

১) সৌন্দর্যমূলক, বিনোদনমূলক এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুরক্ষিত করা।

২) সম্পদ সমূহের নবীকরণ এবং উৎপাদন চক্রের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে অত্যাবশকীয় উদ্ভিদ, প্রাণী এবং বস্তুর উৎপাদনশীলতা দীর্ঘতর করা অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, পরিবেশ সংরক্ষণের মূল

উদ্দেশ্য প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, সুরক্ষা এবং পরিচালন। সুপরিকল্পিতভাবে পরিবেশ সংরক্ষণের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ যথার্থভাবে ব্যবহার করা যায় এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যও নিয়ন্ত্রিত থাকে।

কী কী সংরক্ষণ করা উচিত ?

a) প্রথমত, যেসব প্রজাতি আজ বিপন্ন এবং ধ্বংসের অভিমুখী, তাদেরই শুধু সংরক্ষণ করা উচিত।

b) দ্বিতীয়ত, অর্থকরী প্রয়োজনীয় শস্য ও গাছপালার তালিকা করে তাদের সংরক্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির প্রতীকী মৌলিক উপাদান, শস্য উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে জরুরী। বর্তমানে Transgenic ধান আবিষ্কারের ফলে ধানের পুরানো প্রজাতিগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তা না হলে বাসমতী, সীতাশাল ইত্যাদি প্রজাতির ধান লুপ্ত হয়ে যাবে।

c) Key-stone প্রজাতি (যেসব প্রজাতি অন্য প্রজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে), সেইসব বিশেষ পরাগায়ন (Pollinators) সম্বন্ধে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

d) উদ্ভিদ কলা পালন (Tissue culture) পদ্ধতি দিয়ে আমরা কিছু প্রজাতিকে পুনঃপ্রবর্তন করতে পারি। কিন্তু এদের জীবন সাধারণত ক্ষণস্থায়ী হয়। সেজন্য বীজ থেকে উৎপাদনই প্রকৃষ্ট উপায়। প্রাণীদের ক্ষেত্রে Wild variety -র সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ।

A) **ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ভাণ্ডার ও আধুনিক প্রযুক্তিতে বিজ্ঞান (DNA Storage) :** গাছপালা থেকে DNA নির্যাস করে কৌলিক পদার্থ রক্ষিত করা যায়, সেগুলি থেকে ব্যক্তিগত কৌলিক সংরক্ষণ করা সম্ভব। যদিও তা থেকে নতুন গাছপালার পুনঃপ্রবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু কিছু কিছু প্রয়োজনীয় কৌলিক পদার্থ নির্যাস সংগ্রহ করে কৌলিক প্রকোলনের দ্বারা সেইসব প্রয়োজনীয় অর্থকরী গাছপালা তৈরী করা সম্ভব। জিন ব্যাঙ্ক স্থাপন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

B) **জীবীয় সংরক্ষণ** (Biological Conservation) : সংরক্ষণ বলতে আমরা বুঝি বাস্তুরীতির নির্দিষ্ট স্থিতাবস্থা। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, এই ভূমণ্ডলে কোনো কিছুই গতিহীন নয়। প্রকৃতিতে পরিবর্তন অবধারিত। স্বভাবতই আমরা নিজ স্বার্থে জৈবীয় এবং অজৈবীয় সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করব। মানুষ নির্মমভাবে প্রকৃতিকে বিনষ্ট করছে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। বসুন্ধরার এই দুর্লভ প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য আজ বিশ্বের অসংখ্য কল্যানকামী সংস্থা অবিরত চিন্তা করে চলেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলি হল - প্রকৃতির আন্তজার্তিক সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN), মানুষ ও জীবমণ্ডল (Man and Biosphere - MAB), বন্য সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (World Wildlife Fund - WWF) বিশ্বসংস্থার পরিবেশ রক্ষার কর্মসূচী প্রতিষ্ঠান (United Nation's Environmental Programme) এবং অন্যান্য আরও সংস্থা আছে যারা প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নয়।

জীববৈচিত্রের প্রধান উপাদান দুটি হল উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুল। এখানে উদ্ভিদদের সংরক্ষণের কিছু পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

৭.৭.১ ঃ উদ্ভিদ সংরক্ষণ

জীবমণ্ডলে প্রাণ ধারণের জন্য গাছপালার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গাছপালা সালোকসংশ্লেষের দ্বারা সূর্যের শক্তি গ্রহন করে, যা পরবর্তীকালে প্রাণীদেহে খাদ্যের মাধ্যমে প্রবেশ করে। সুতরাং জীবনধারনের জন্য গাছপালার সংরক্ষণ অতীব প্রয়োজনীয়। আমাদের অপরূপ পৃথিবীতে প্রায় 3 লক্ষ সপুস্পক গাছপালা আছে। আছে 2 লক্ষের মতো শ্যাওলা জাতীয় গাছ এবং ফার্ণ, সরলবর্গীয় ও মস জাতীয় নিম্নবর্গের বহু প্রজাতি, যার সংখ্যা প্রায় 5 লক্ষের মতো। এই বাস্তু রীতিতে সব প্রজাতিরই বিশেষ বাসস্থান আছে এবং তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভূমিকা পালন করে আমাদের জীব সমাজকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখার জন্য। সুতরাং শুধুমাত্র কিছু কিছু নির্বাচিত প্রজাতিকে সংরক্ষণ করলে বিশেষ লাভ হবে না। আবহাওয়া, জলবায়ু এবং জমির উর্বরতার জন্য উদ্ভিদ সম্পদ আমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। নানাবিধ প্রক্রিয়ায় নিজস্ব বাসস্থানে / স্বস্থানে (Insitu Conservation) এগুলি সংরক্ষণ করা সম্ভব।

বাস্তুরীতি আজ চরম বিপদের মুখোমুখি। সুতরাং নিজেদের স্বার্থে বাস্তুরীতি অক্ষুন্ন রাখতে অবিলম্বে আমাদের সংরক্ষিত এলাকা, জাতীয় উদ্যান (National Park), অভয়ারণ্য (Sanctuaries) প্রভৃতি আরও সৃষ্টি করা কর্তব্য।

আমাদেরকে নিজস্ব বাসস্থান বহির্ভূত অঞ্চলে যেমন উদ্ভিদ উদ্যান বা মাঠে বা কলা-পালন Laboratory ইত্যাদি স্থানে বীজ ও কলা (tissue) সংরক্ষণ, Ex-situ conservation মাধ্যমে করা দরকার এবং জীন ভাণ্ডার (Gene Bank) গঠন করা দরকার।

গাছপালা সংরক্ষণ এখন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। কারণ বহু প্রজাতি ধ্বংস হয়েছে এবং অন্যান্য আরও প্রজাতি ধ্বংসের পথে চলেছে। আমাদের এই পৃথিবীর মাত্র 7% ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য (Tropical Rain Forest) দ্বারা আচ্ছাদিত। কিন্তু সমস্ত প্রজাতির প্রায় শতকরা 50 ভাগ এই জায়গার অন্তবর্তী। এবং মানুষের স্বার্থপরতার কারণে প্রায় সমস্ত rain forest আজ ধ্বংসের অভিমুখী। সুতরাং বলা যায় যে, বহু প্রজাতি আজ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং অন্যান্য প্রজাতি আজ তাদের অস্তিত্ব নিয়ে কঠিন সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। Raven (1988) একটি সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, আজ এইসব tropical/ Sub-tropical অঞ্চল থেকে প্রতি বছর প্রায় 2000 প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন যে, এইভাবে ধ্বংসলীলা চললে, আগামী শতাব্দীতে পৃথিবীর গাছপালা প্রায় অর্ধেক হয়ে যাবে।

গাছপালা যে শুধুমাত্র খাদ্য জোগায় তা নয়, বাসস্থানের সামগ্রী, ঔষধপত্র এবং অন্যান্য অতি অত্যাবশকীয় বস্তুও প্রদান করে থাকে। সুতরাং আজ মানুষের নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই গাছপালার সংরক্ষণ করা একান্ত জরুরী।

এ পর্যন্ত মাত্র শতকরা 10 ভাগ গাছপালা চিহ্নিত করা গেছে। যাদের বনৌষধি এবং কৃষিকার্যের কাজে ব্যবহার করা যায়। আরও অনেক বনৌষধি ও শস্য আছে, যাদের এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, এ সম্বন্ধে আরও সজাগ হতে পারে।

জীববৈচিত্রের এই যে সমারোহ, এটিকে ঠিকমতো পরিচালিত করতে হলে প্রাকৃতিক বাস্তুরীতি রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

১.৭.১.১. In-situ সংরক্ষণ

বেশ কিছু গাছপালা নিজেদের স্বাভাবিক অবস্থানে খুব ভালো জন্মায়। বড়ো বড়ো গাছপালা এদের মধ্যে অন্যতম।

জীববৈচিত্র্যের প্রচলিত প্রথা অনুসারে In-situ (নিজস্ব বাসস্থানে) সংরক্ষণেই শ্রেয় এবং ex-situ সংরক্ষণকে ২য় স্থানে রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়।

৭.৭.১.২ ঃ Ex-situ সংরক্ষণ

কিছু সংখ্যক গাছপালা Ex-situ প্রক্রিয়ায় এবং পুনঃপ্রবর্তনে রক্ষা করা যায় আবহাওয়া পরিবর্তন করে, তাদের নিজস্ব বাসস্থান পরিবর্তন করে নতুন জায়গায় বসতি স্থাপন করে। প্রয়োজনবোধে উদ্ভিদ সংরক্ষণ পার্ক ও সংরক্ষিত জায়গায় করা উচিত।

অনেক সময় বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির পুনঃপ্রবর্তনের জন্য In-situ এবং Ex-situ উভয় প্রকারেই সংরক্ষণে চেষ্টা করা হয়। যেখানে স্বাভাবিক আবাস (habitat) হারিয়ে যায়। সেখানে Ex-situ -র মাধ্যমে তাদের পুনঃবাসনের চেষ্টা করা হয়। ভবিষ্যতে বেশ কিছু বিরল প্রজাতি কতকগুলি জায়গায় নতুন করে স্ব-আবাসনের (In-situ) মাধ্যমে পুনঃপ্রবর্তনের প্রচেষ্টা করা উচিত।

উদ্ভিদ উদ্যানে গাছপালা সংরক্ষণের (Ex-situ conservation) সীমাবদ্ধতা আছে। কিছু কিছু বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির জন্য অনু বিস্তার (micro-propagation) বন্দোবস্ত রাখা উচিত, যাতে তাদের ঠিকমতো পুনঃপ্রবর্তন করা যায়।

বিপন্ন প্রজাতির গাছপালা রক্ষার জন্য আরও অনেক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বড়ো বড়ো উদ্যান (Botanical gardens) আছে। কিন্তু এগুলি নিজেদের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। এজন্য দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে এই মুহূর্তেই যাতে সমবেতভাবে আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করতে পারি তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

সংরক্ষিত আয়তন : উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুলের সংকটপূর্ণ সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষিত আয়তনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রজাতির ধ্বংসের হার ও অধিকাংশ প্রজাতির কৌলিক নষ্ট হবার প্রবণতা, সংরক্ষিত আয়তনের ঠিক বিপরীতভাবে সমানুপাতিক।

৭.৭.২ ঃ 'সংরক্ষিত জীবমণ্ডলের' মণ্ডলকরণের নকশা

'সংরক্ষিত জীবমণ্ডলের' মণ্ডলকরণের জন্য UNESCO এবং UNEP (United Nations Environmental Programme) -এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি 'টাস্কফোর্স' (task force) গঠিত হয়। টাস্কফোর্স প্রস্তাবিত সরল নকশা অনুসারে 'সংরক্ষিত জীবমণ্ডল' ৩টি মণ্ডল বা অঞ্চল নিয়ে গঠিত। যথা —

১। কেন্দ্রীয় মণ্ডল

২। নিয়ন্ত্রক মণ্ডল

৩। পরিবৃত্তি মণ্ডল

১। **কেন্দ্রীয় মণ্ডল (Central Zone) :** নিয়ন্ত্রক বা বাফার মণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্ঠিত সংরক্ষিত জীবমণ্ডলের কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে 'কেন্দ্রীয় মণ্ডল' বলা হয়। জাতীয় উদ্যান বা অভয়ারণ্যের মতো কেন্দ্রীয় মণ্ডলে বহিরাগত প্রাণী বা মানুষের অবৈধ প্রবেশ সম্পূর্ণরূপেই নিষিদ্ধ। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মণ্ডলের আবাসিক প্রাণীকুল এবং উদ্ভিদকুল মানুষের অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণরূপেই সুরক্ষিত থাকে। এই মণ্ডলে কেবল পরিবেশ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ক্রিয়াকলাপ মঞ্জুরিকৃত হয়। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মণ্ডলে কোনো মনুষ্য বসতি থাকে না।

কেন্দ্রীয় মণ্ডল	১. পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র
নিয়ন্ত্রক মণ্ডল	২. শিক্ষা ও অনুশীলন কেন্দ্র।
পরিবৃত্তি মণ্ডল	৩. গবেষণাকেন্দ্র
	৪. পর্যটন কেন্দ্র
	৫. মনুষ্যবসতি

২। **নিয়ন্ত্রক মণ্ডল (Buffer Zone) :** সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত যে অঞ্চল দ্বারা কেন্দ্রীয় মণ্ডল পরিবেষ্ঠিত তাকে 'নিয়ন্ত্রক মণ্ডল' বা Buffer Zone বলা হয়। এই মণ্ডলে পরিবেশ সংক্রান্ত শিক্ষা এবং অনুশীলন, পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা এবং পর্যটন মঞ্জুর করা হয়। নিয়ন্ত্রক মণ্ডলে চাষাবাদ গবাদি পশু প্রতিপালন এবং সাময়িক মনুষ্যবসতির অনুমতি দেওয়া হয়।

৩। **পরিবৃত্ত মণ্ডল (Transition Zone) :** নিয়ন্ত্রক মণ্ডলের পরিবেষ্টক অঞ্চলকে 'পরিবৃত্তি মণ্ডল' (Transition Zone) বলা হয়। এই অঞ্চলটি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত নয়। নিয়ন্ত্রক মণ্ডল মূলত সংরক্ষিত জীবমণ্ডলের বিকাশমূলক ভূমিকা পালন করে সংরক্ষিত জীবমণ্ডলের অজীব এবং সজীব সম্পদের পুষ্টিসাধনপূর্ণ পরিচালন পরিবৃত্তি মণ্ডলে বসবাসকারী স্থানীয় বাসিন্দা, পরিচালক এবং গবেষকের মধ্যে সহযোগিতামূলক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

৭.৮ ঃ সারসংক্ষেপ (Summing up)

পরিবেশ শিক্ষা হল পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতা বিকাশে সেই সমস্ত সংগঠিত সক্রিয়তা, যেগুলির দ্বারা মানুষ তার আচরণ ধারাকে নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠিত করার মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট বাস্তুতন্ত্রগুলি সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে এনে স্থায়ীভাবে বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের কাম্য, স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। অর্থাৎ পরিবেশমূলক শিক্ষা একটি শিখন প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তির মধ্যে তার পরিবেশের সম্পর্কে জ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে, সেই বিপদের মোকাবিলা করার মতো প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও দক্ষতা, উপযুক্ত মনোভাব ও প্রেরণার সৃষ্টি করে, তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও দায়িত্বশীল কর্ম সম্পাদনের যোগ্য করে গড়ে তোলা। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলি হল দুই শ্রেণীর জৈব উপাদান এবং অজৈব বা জড় উপাদান। পরিবেশ সাধারণত দুই প্রকারের যথা প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ। সমস্তরকম জ্ঞান

ও কৌশল মানুষের আয়ত্ত করার আগে দাবি জানাচ্ছে পরিবেশ রক্ষার পাঠ, যা সঠিকভাবে নিতে না পারলে, পৃথিবীর অস্তিত্ব-ই সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে, আমরা কেউ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারব না। বিপদের গভীরতা উপলব্ধি করেই আমাদের দেশের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট শিক্ষার সর্বস্তরে পরিবেশমূলক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষায় পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এই পৃথিবীকে আগামী প্রজন্মের বাসযোগ্য করার দায়িত্ব আমাদের এই বোধ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য পরিবেশমূলক শিক্ষা এই স্তরে প্রয়োজনীয়।

৭.৯ ঃ প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) পরিবেশের সংজ্ঞা দিন।
২) পরিবেশের উপাদানগুলি কী কী?
৩) পরিবেশ কয় প্রকারের এবং কী কী?
৪) পরিবেশমূলক শিক্ষা কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) পরিবেশের বিস্তৃত ধারণা দিন।
২) পরিবেশ শিক্ষার লক্ষ্য কী?
৩) পরিবেশ সংরক্ষণ বলতে কি বোঝায় সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১) মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
২) পরিবেশমূলক শিক্ষার উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩) পরিবেশ শিক্ষার পরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৪) পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

References :

1.	**Mondal Dilip Kumar : Population and Environmental Education**	
2.	**শিক্ষার দার্শনিক ও সামাজিক ভিত্তি :**	**ডঃ উজ্জ্বল কুমার পাণ্ডা** **ডঃ মিহির চট্টোপাধ্যায়** **ডঃ স্বপন সেন**
3.	**জনসংখ্যা ও পরিবেশ শিক্ষা :**	**ড. দিলীপ কুমার মণ্ডল**
4.	**পরিবেশ শিক্ষা :**	**রাজীব সরকার**

একক : ৮

ভারতীয় শিক্ষায় উদ্ভুত সমস্যাবলী

EMERGING PROBLEMS CONCERNED IN INDIAN EDUCATION

গঠন (Structure)

- ৮.১ উদ্দেশ্য
- ৮.২ সূচনা
- ৮.৩ শিক্ষার সমসুযোগ
    - ৮.৩.১ তপশিলি জাতিদের জন্য সুযোগ
    - ৮.৩.২ তপশিলি উপজাতিদের জন্য সুযোগ
    - ৮.৩.৩ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সুযোগ
    - ৮.৩.৪ প্রতিবন্ধীদের জন্য সুযোগ
    - ৮.৩.৫ সংবিধানে সমসুযোগের ব্যবস্থা
- ৮.৪ পশ্চাৎপদগোষ্ঠী
- ৮.৫ পশ্চাৎপদতার কারণ
- ৮.৬ পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের উপায়সমূহ
- ৮.৭ জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতা
    - ৮.৭.১ জাতীয় সংহতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা
    - ৮.৭.২ ভারতে জাতীয় অসংহতির কারণ
    - ৮.৭.৩ জাতীয় সংহতি ও শিক্ষা
    - ৮.৭.৪ জাতীয় সংহতি স্থাপনে শিক্ষার পুনর্বিন্যাস
    - ৮.৭.৫ শিক্ষা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ
    - ৮.৭.৬ আন্তর্জাতিকতার জন্য শিক্ষার মূলনীতি
    - ৮.৭.৭ শিক্ষালয় ও আন্তর্জাতিকতাবোধের শিক্ষা।
- ৮.৮ সারসংক্ষেপ
- ৮.৯ প্রশ্নাবলী

শিক্ষার সমসুযোগ

(Equality of Education opportunities)

৮.১ ঃ সূচনা (Introduction)

স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের বহু চেষ্টা হয়েছে। বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষার দিক থেকে অর্থাৎ সব শ্রেণীর মানুষদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষার ক্ষেত্রে সমসুযোগের সুফল পাওয়া যায়নি। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, সমসুযোগের নীতিকে কার্যকরী করতে হলে সমস্ত শ্রেণীর মানুষদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করতে হবে। পৃথিবীতে প্রত্যেকটি শিশুরই শিক্ষাক্ষেত্রে সমান অধিকার আছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমস্ত মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া তা অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। আর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে নূন্যতম শিক্ষার প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে মানুষ আজ অগ্রগতির চূড়ায় উঠতে চাইছে। কিন্তু সেই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার জন্য চাই মানব সম্পদের যথাযথ মানোন্নয়নের। শিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব এটা আজ সকলেই অনুধাবন করতে পারছেন।

৮.২ ঃ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়ের পাঠে শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে সমর্থ হবে—

(i) শিক্ষাক্ষেত্রে সমসুযোগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

(ii) অনগ্রসর জাতিদের সম্পর্ক সম্যক জ্ঞান লাভ করবে।

(iii) বিভিন্ন অনগ্রসর জাতিদের সুযোগ সুবিধাগুলি জানতে পারবে।

(iv) জাতীয় সংহতি কি? জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবে।

(v) আন্তর্জাতিক মূলনীতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

৮.৩ ঃ শিক্ষার সমসুযোগ (Equality of Education opportunities)

সাধারণ অর্থে সমসুযোগ বলতে বোঝায় প্রতিটি নাগরিককে সমান অধিকার দেওয়া। যে কোন দেশেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশের প্রত্যেকটি শ্রেণীর নাগরিক যাতে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পায়। শিক্ষার সমসুযোগ সৃষ্টি কর্তারা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক লক্ষ্য। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য যদি শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ না করা যায় তাহলে কোন দেশেরই উন্নয়ন সম্ভব নয়। ন্যূনতম শিক্ষার প্রথম পর্যায় হল প্রাথমিক শিক্ষা - যা আবার পরবর্তী শিক্ষা পর্যায় সমূহের ভিত। সমাজের, জাতির বা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন দেশের প্রত্যেকটি শিশু শিক্ষার আওতায় আসবে সমান সুযোগ পেয়ে। শিক্ষার সমানসুযোগের নীতি বলতে আমরা শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের অতিরিক্ত বিশেষ সুযোগ দানের ব্যবস্থাকে বুঝি। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, সমসুযোগের নীতিকে কার্যকরী করতে হলে অনগ্রর শ্রেণীর মানুষদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করতে হবে।

শিক্ষার সমসুযোগ বলতে বোঝায় ধর্ম, বর্ণ, জাতি, সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক সংহতি, স্ত্রী-পুরুষ বা অঞ্চল নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের নিজস্ব প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুসারে আত্মবিশ্বাসের সুযোগ করে দেওয়া।

শিক্ষার সমসুযোগ সৃষ্টির বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই সমস্থ প্রয়োজনীয়তাগুলি হল - গণতন্ত্রকে সার্থক করা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সম্ভাব্য প্রতিভার বিকাশ সাধন, উন্নত ও দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার ব্যবধান কমিয়ে আনা, দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, দক্ষ নাগরিক গঠন, জাতীয় সংহতি বজায় রাখা ইত্যাদি।

শিক্ষার সুযোগের বৈষম্য সৃষ্টির বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এই রকম কিছু কারণ হল—জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব, বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বন্টনের অভাব, বৃত্তি প্রদান ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, হোস্টেল ব্যবস্থার অভাব, দারিদ্রতা, স্কুল কলেজগুলির শিক্ষার মানের তারতম্য, সামাজিক পরিবেশের পার্থক্য ইত্যাদি।

শিক্ষার সমসুযোগ সৃষ্টির জন্য যে সব শ্রেণীর মানুষের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে, সেগুলি হল— (১) তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা, (২) সংখ্যালঘুদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা (৩) নারীদের জন্য শিক্ষা (৪) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা এবং (৫) বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা।

৮.৩.১ ঃ তপশিলি জাতিদের জন্য সুযোগ

ভারতের তপশিলি জাতিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজ স্বাধীনতার আগেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সামাজিক অবহেলা এবং বঞ্চনার ফলে তপশিলি শ্রেণির মানুষেরা শিক্ষার গড় হার থেকে পিছিয়ে পড়েছে। তপশিলি জাতিদের সুযোগের নীতি অনুযায়ী যদি সঠিক স্তরে আনতে হয় তবে বিশেষ ব্যবস্থাগুলি হল—

১) প্রত্যেক তপশিলি জাতি মানুষ যে ভারতীয় নাগরিক এবং স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে যে তাদেরও সকল বিষয়ে সমান সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে, সে বিষয়ে সচেতন করে তোলা।

২) এই শ্রেণিভুক্ত মানুষেরা যাতে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করতে পারে সেজন্য তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) উচ্চশিক্ষার জন্য বাড়ি থেকে দূরে এসে শিক্ষার্থীরা যাতে সরকারী খরচে থাকতে পারে তার আঞ্চলিক ভিত্তিতে হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪) আইন প্রয়োগ করে সামাজিক অধিকার যে সমান এই বোধ শক্তি তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে।

৫) তপশিলি জাতি ভুক্ত অঞ্চলে ছাত্র সংখ্যা কম হলেও বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। জাতীয় গ্রামীন শিক্ষা কর্মসূচীতে এ বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে সংরক্ষণ নীতিকে কার্যকর করতে হবে।

৭) প্রতিটি বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট হারে তপশিলি শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগ করতে হবে।

ভারতে তপশিলি জাতির মানুষদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা:-

ভারতে তপশিলি শ্রেণিভুক্ত মানুষদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজ স্বাধীনতার আগেই শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতার পর এ বিষয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলিই হল—

১) সাধারণ শিক্ষালয়গুলিতে তপশিলি জাতি শিক্ষার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করায় এরা সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে তারা সকলের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেলামেশার সুযোগ পাচ্ছে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ছে।

২) বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ ও অন্যান্য খরচ চালানোর জন্য সরকারী সাহায্য বা অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩) শিক্ষা সম্প্রসারনের উদ্দেশ্যে শিক্ষার সকল স্তরে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে তপশিলি জাতিদের মধ্যে।

৪) বর্তমানে চাকুরির ক্ষেত্রে তপশিলি জাতিদের জন্য সংরক্ষণের নীতি অনুসরণ করা হয়। ফলে এরা সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মেশার সুযোগ পাচ্ছে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণের ফলে, এদের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তারা সমাজের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে।

৮.৩.২ ঃ তপশিলি জাতিদের জন্য সুযোগ

তপশিলি জাতিদের তুলনায় উপজাতিভুক্ত মানুষের শিক্ষার হার অনেক কম। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে সমসুযোগ নীতির ভিত্তিতে এদের জন্যও বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে যে সমস্ত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া দরকার সেগুলি হল—

১) উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

২) আমাদের দেশে বিভিন্ন উপজাতির নিজস্ব ভাষা আছে। তারা যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য তাদের ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে তাদের ভাষারও উন্নতি হবে এবং শিক্ষার প্রতিও আগ্রহী হবে।

৩) অবিভাবকেরা যাতে তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহিত হন, তার জন্য আর্থিক ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) উপযুক্ত উপজাতিভুক্ত মানুষদের বেশি সংখ্যায় শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগ করতে হবে।

৫) বিভিন্ন জাতিদের জীবন প্রণালী এবং পরিবেশ অনুশীলন করে তাদের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যক্রম এবং বিশেষ শিক্ষণ পদ্ধতি রচনা করতে হবে।

৬) উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে পৃথক পৃথক অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। কারণ, উপজাতিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সামনাধিকার প্রদানের জন্য শিক্ষা-সম্প্রসারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৭) উপজাতিদের শিক্ষার বিষয়টি তদারকি করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে যেসব বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে আগ্রহী তাদের সরকারী ভাবে উৎসাহ দিতে হবে এবং প্রয়োজনে এই কাজের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) উপজাতিদের শিক্ষার বিষয়টি তদারকি করার জন্য পৃথক বিভাগ খুলতে হবে যারা এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তার ভিত্তিতে উপযুক্ত শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করবে।

৮.৩.৩ ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সুযোগ

ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ সেভাবে সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে না পারার ফলস্বরূপ তারা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে পিছিয়ে পড়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সমসুযোগের নীতি মেনে নিয়ে এই সব শ্রেণীর মানুষদের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এদের শিক্ষার কথা ভেবে নিম্নলিখিত বিশেষ ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যায়।

১) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিজ নিজ শ্রেণীভুক্ত মানুষদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহিত করতে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

২) ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এদের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষার পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হবে।

৩) বিশেষ পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করতে পারলে তারা শিক্ষার যে সমস্ত সুযোগ রয়েছে সেগুলি গ্রহণ করতে পারবে।

৮.৩.৪ ঃ প্রতিবন্ধীদের সুযোগ

প্রতিবন্ধী শিশুরা দীর্ঘ অবহেলিত এবং অবজ্ঞার শিকার। বিভিন্ন দিক থেকে এরা বঞ্চনার শিকারও হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে মোট জনস্যংখ্যার একটি বড় অংশ নানা শ্রেণির প্রতিবন্ধী। যেমন - দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধীতা, শিখন প্রতিবন্ধীতা, মানসিক প্রতিবন্ধীতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তুলনামূলকভাবে এদের শিক্ষার কথা চিন্তা করে নিম্নলিখিত বিশেষ ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যায়।

১) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল তাদেরকে ভবিষ্যতে কোনো বৃত্তিমুখী কাজের সঙ্গে যুক্ত করা এবং প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২) প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় বেশি সংখ্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩) বিশেষধর্মী শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকেরও প্রয়োজন হবে। তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষকের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৪) প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে সমবেদনার সঙ্গে এবং সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে এদের শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আইনগত বিধিনিষেধ শিথিল করতে হবে।

৫) বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, ভ্রাম্যমান শিক্ষক এবং রিসোর্স কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮.৩.৫ ঃ সংবিধানে সংসুযোগের ব্যবস্থা (Constitutional Provisions for ensuring equality)

ভারতীয় সংবিধানে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের সামগ্রিক কল্যান ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। সংবিধানের ৩৩০-৩৪২ নং ধারার কথা বাদ দিলেও ১৫(৪), ১৬(৪), ১৭ এবং ১৯(৫) নং ধারায় তপশিলি শ্রেণিদের মধ্যে বিভিন্ন সংরক্ষমূলক ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়েছে। সংবিধানের ৪৬ নং ধারায় তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি সমেত অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এবং সবরকম শোষনের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

তপশিলি ভুক্ত জাতি, তপশিলি ভুক্ত উপজাতি ছাড়াও ভারতে বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুন্নত। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতে গণতান্ত্রিক সাম্যের আদর্শকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে এবং সমান মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সমস্ত ব্যবস্থার তাৎপর্য অপরিসীম।

১) ভারতের সংবিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমানাধিকার স্বীকার করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিশেষ বিশেষ অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সাম্যের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রে কেবল ধর্ম, বর্ণ, জাতি, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান ভেদে তারা কোনো একটির ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারেন না [১৫(১) নং ধারা]। তবে নারী, শিশু, সামাজিক ও শিক্ষাগত বিচারে অনুন্নত শ্রেণি এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

২) **শিক্ষা ও চাকুরিতে সংরক্ষণ :** পরিপূর্ণ ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সব স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্তরে তপশিলি জাতির জন্য ১৫% ও তপশিলি উপজাতির জন্য ৭.৫% আসন সংরক্ষিত হয়েছে। কোন পাঠক্রমে ভর্তির ক্ষেত্রে এই সংরক্ষিত আসনগুলিতে ওই বিশেষ শ্রেণিভুক্ত আবেদনকারীদের মধ্য থেকেই নির্বাচন করার ব্যবস্থা আছে। সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সমস্ত সংস্থায় উপরোক্ত অনুপাতে পদ সংরক্ষিত করা হয়েছে। অবশ্য রাজ্য স্তরে এই শতাংশের হার জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে নির্ধারিত হয়। যেমন— পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ২২% ও ৬%। সংরক্ষিত আসনগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত প্রার্থীদের মধ্য থেকেই যোগ্যতা বিচারের ভিত্তিতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়।

৩) **প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে শিক্ষামূলক উপকরণ সরবরাহ :** আমাদের দেশের প্রায় সমস্ত রাজ্যেই, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরকার বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমানে প্রচলিত সর্বশিক্ষা মিশনের এটি অন্যতম কার্যক্রম।

৪) **মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা :** অনুন্নত শ্রেণীর শিশুদের যে অংশ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে বিদ্যালয়ে যেতে অপারগ তাদের তার বয়সি অন্য সবার সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এজন্য বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা করা, শিক্ষকদের বিশেষভাবে সচেতন ও প্রশিক্ষিত করা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫) **সব শিশুকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিকরণ :** অনুন্নত শ্রেণীর শিশুদের যে অংশ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবদ্ধকতার কারণে বিদ্যালয়ে যেতে অপারগ তাদের তার বয়সি অন্য সবার সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এজন্য বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা করা, শিক্ষকদের বিশেষভাবে সচেতন ও প্রশিক্ষিত করা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬) **মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষায় পড়াশুনার সুযোগ :** বিশাল এই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু উপজাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষার্থী বর্তমান যাদের মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষা বিদ্যালয়ের ভাষা নয়। অথচ প্রথাগত শিক্ষার অন্ততঃ প্রথম স্তরে মাতৃভাষা বাঞ্ছনীয়। স্বাধীন ভারতে প্রধান ভাষাগুলি ছাড়াও বহু সংখ্যক স্থানীয় ও উপজাতি ভাষাকে বিদ্যালয় পাঠক্রমের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন—পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালি ভাষা, ত্রিপুরা ও অসমে কক্‌বরক ভাষা, ঝাড়খণ্ডে কুর্মালি ভাষা ইত্যাদি।

৭) **আর্থিক অনুদান :** তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় পরবর্তী শিক্ষাস্তরে ব্যয়নির্বাহের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে নিয়মিত বৃত্তি ও ভাষা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

৮) **নতুন বিদ্যালয় স্থাপন :** নূন্যতম জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যাতে প্রতিটি শিশু তার বাসস্থানের এক কিলোমিটারের মধ্যে অন্তত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণের ব্যবস্থা যুগ্মভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের অর্থানুকূল্যে করা হচ্ছে।

৮.৪ ঃ পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী (Backward Community–Causes and remedial measures)

যে কোন কাজ সমাজে আধুনিককালে শিক্ষাকে সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কিছু কিছু মানুষ নিজ প্রতিভা ও ক্ষমতা বলে অন্যদের থেকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরাই সমাজের অধিকাংশ সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতা ভোগ করছেন এবং অন্যান্যরা তাঁদের থেকে পিছিয়ে পড়ছেন, সুযোগ সুবিধা নিজেদের আয়ত্তে না আনতে পারার কারণে নিজেদের পূর্ণ বিকাশে অসমর্থ হচ্ছেন। কালক্রমে ও বংশপরম্পরায় দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা পিছিয়েই থাকছেন ও ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে পশ্চাৎপদ শ্রেণি হিসাবে পরিগণিত হচ্ছেন। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এঁরা নিজেদের বিকাশসাধনে অসমর্থ হয়ে পড়ছেন। অন্ন, পরিধেয়, বাসস্থান,শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদির নিরিখে এঁদের জীবনযাপনের মান প্রথম শ্রেণিভুক্ত মানুষদের থেকে নিম্নপর্যায়ের হয়ে পড়তে থাকে এবং কালক্রমে এঁরা সেটিকেই নিজেদের ভবিতব্য হিসাবে মেনে নিয়ে জীবনধারা নির্বাহ করতে থাকেন। ‘ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের’ প্রতিবেদনে শিক্ষাকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে তা জাতীয় আদর্শের উপযোগী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। কিন্তু সমাজের সকল ব্যক্তি যদি সমান সুযোগসুবিধা ভোগ করতে না পারে বা সমাজের মধ্যে যদি কিছু ব্যক্তি সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চত হয়, তবে সামাজিক পরিবর্তন বা উন্নতি সম্ভব নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামাজিক বিবর্তনের ধারা অনুশীলন করলে দেখা যায়, সমাজের একশ্রেণীর মানুষ অগ্রগতির মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এইসব ব্যক্তিরা সমাজের মূল দেহ থেকে জীবনশক্তি সংগ্রহ করতে পারে না, ফলে দলগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পিছিয়ে

পড়ে। চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রেও এঁদের মান অন্যান্য শ্রেণীভুক্তদের থেকে নিচে থাকে। তাদেরকেই বলা হয় পশ্চাৎপদগোষ্ঠী বা দুর্বল শ্রেণীভুক্ত মানুষ

যেহেতু শিক্ষা একপ্রকার সামাজিক সুযোগসুবিধা, সেহেতু পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা এর থেকেও বঞ্চিত হয়। তাই এই শ্রেণীভুক্ত মানুষেরা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ভারতীয় সামাজিক পটভূমিতেও এই শ্রেণীর শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

ভারতীয় সমাজে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ :

পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে কিছু মানুষকে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীভুক্ত বলা হয়। কিন্তু এই জাতীয় শ্রেণীকরণের কোন নির্দিষ্ট মান নেই। তবে ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ বলতে অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা দুর্বল, শিক্ষাগত দিক থেকে যারা অনগ্রসর এবং সামাজিক পরিবর্তনের যারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না, তারাই পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত।

ভারতে বেশিরভাগ মানুষই গরিব এবং নিরক্ষর, তবে সব দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষই পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত নয়। যারা সাধারণ ভারতীয় মানের তুলনায় অনেক বেশি গরিব, অনেক বেশি সংখ্যায় নিরক্ষর এবং অনেক বেশি পরিমানে সামাজিক দিক থেকে অবহেলিত তারাই পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীভুক্ত।

ভারতীয় সংবিধানে নিম্নলিখিত দুইশ্রেণীর মানুষকে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীভুক্ত বলা হয়েছে—

i) তপশিলি জাতি (Scheduled caste)

ii) তপশিলি উপজাতি (Scheduled Tribe)

বর্তমানে আরও কিছু ভারতীয় গোষ্ঠীকে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং তাদের বলা হয় 'অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ' (Other backward class)। তবে এই শ্রেণীভুক্ত মানুষদের জন্য এখনও কোনো সুনির্দিষ্ট শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করা হয়নি, শুধুমাত্র চাকুরির ক্ষেত্রে এদের জন্য পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তপশিলি জাতি : প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার যুগে ভারতীয় হিন্দু সমাজে কর্মের ভিত্তিতে মানুষেরা শ্রেণীবিভাগ করা হত যাকে বলা হত বর্ণাশ্রম। এই রীতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র — এই চারবর্ণের লোক ছিল। প্রথম দিকে এটি কর্ম বা বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই প্রথা গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতায় পর্যবসিত হওয়ায় বিভিন্ন বর্ণের মানুষদের জন্য সামাজিক সুযোগ সুবিধা বন্টন ও শিক্ষারও তারতম্য লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মণরা উচ্চশিক্ষা এবং সবচেয়ে বেশি সামাজিক সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিল। ক্ষত্রিয়রা প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সাধারণ শিক্ষাও পেত। বৈশ্যরা বিশেষভাবে বৃত্তিমূলক পরিশিক্ষণ লাভ করত। কিন্তু শুদ্রদের কোনরকম নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার অধিকার ছিল না। ফলে শুদ্ররা ছিল সমাজে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা চলার ফলে সমাজের এই শ্রেণীর মানুষেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ন্যায়বিচার পায়নি। এদেরকে বলা হয় অচ্ছুত (Untouchable)। বৃটিশরা এদের 'Exterior castes' বলত। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় আইনের ধারায় এদের Scheduled castes বা তপশিলি জাতি আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতীয় সংবিধানেও (১৯০৫) এদের তপশিলি জাতি বলা হয়েছে।

তপশিলি উপজাতি : ভারতীয় সংবিধানে প্রায় ১০০-র বেশি জাতিকে তপশিলি উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতীয় জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৮ ভাগ এই তপশিলি উপজাতিভুক্ত। যদিও উপজাতিদের সঠিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে, তবু ভারতবর্ষে উপজাতি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—

i) উপজাতি মানবগোষ্ঠীর বেশিরভাগ অংশ বৃহত্তম সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বনে জঙ্গলে বসবাস করে।

ii) এরা ভারতীয় কৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন।

iii) এরা অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও কৃষ্টিগত দিক থেকে সাধারণ ভারতীয় মানের তুলনায় অনেক পিছিয়ে।

iv) সাধারণভাবে সমাজের অগ্রসর অংশের থেকে তাঁরা দূরে থাকতে চান।

v) অগ্রসর শ্রেণীর জোর জুলুমের হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং স্বাধীনভাবে বসবাস করতে এরা দুর্গম স্থানে বসবাস, নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াসে নিজেদের খাদ্যাভাস, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিকে পরিবর্তন করেও সে সমস্ত মানবগোষ্ঠী সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন তাঁরাই ‘তপশিলি উপজাতি’ নামে চিহ্নিত হয়েছেন। এই গোষ্ঠীগুলির সদস্য সংখ্যা খুবই কম।

Arunachal Pradesh is the homeland of various tribes having customs and traditions Most of the tribes claim their origin from Abo Tani, the ancedtral fore father. Different tribes such as Monpas, Apa Tenis, Nishis, Membas, Khambas, Nocte, Singhpo, Tangsa, Wancho, Miri, Mishmi, Ballong, Minyongs, Tagins, Pasi, Padam and many smaller tribes live in the different districts of Arunachal Pradesh. It has its own tribal laws and customs. The people belive in Supernatural powers such as spirits, gods and goddesses - To please them, they celebrate many festivals such as Si-donji, Mopin, Solung and many others. The remarkable thing is that the present generation of tribal students are in a great progress. This is no doubt, that with self-reliance and pride in their culture, the tribal people of Arunachal Pradesh will shed lustre on the tapestry of Indian's rich cultural heritage.

৮.৫ ঃ অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়

যে সমস্ত সম্প্রদায় জীবন সংগ্রামে পিছিয়ে পড়েছেন ও নানা কারণে বংশানুক্রমে পিছিয়ে থেকে নিজেদের তুলে আনতে ব্যর্থ হচ্ছেন, তাঁরাই পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ছেন। পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যেগুলি ‘তপশিলি জাতি’ ও তপশিলি উপজাতি’র তালিকাভুক্ত নয়, অথচ আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিরিখে সমাজের মূল ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না, ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছেন সেই জনগোষ্ঠীগুলিকে ‘অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পশ্চাৎপদতার কারণ :

বিশাল এই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর একটা বড়ো অংশ নানা ধরনের প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে আর্থ সামাজিক ও শিক্ষার দিক থেকে পশ্চাৎপদ হয়ে

আছেন। সব গোষ্ঠীর পশ্চাৎপদতার কারণ আবার একই নয়।পশ্চাৎপদতার নানাবিধ কারণগুলিকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল—

১) অর্থনৈতিক কারণ (২) সামাজিক কারণ (৩) শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কারণ। এই তিনটি কারণ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

অর্থনৈতিক কারণসমূহ :

১) **দারিদ্র :** দারিদ্র পশ্চাৎপদতার অন্যতম প্রধান কারণ। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে গেলে অর্থব্যয় করতে হয়। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম শর্ত হচ্ছে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রয়োজনীয় অনুপাতে পাওয়া। এগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি অত্যাবশ্যকীয়। গরীব মানুষের পক্ষে এই তিনটি জোগাড় করা খুবই মুশকিল। বর্তমানে বিশ্বে একটা বড়ো অংশের মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছেন বা করতে বাধ্য হচ্ছেন। এর ফলে জীবন বিকাশের নূন্যতম প্রয়োজনীয় উপকরণ আয়ত্তে আনতে তারা সক্ষম হচ্ছেন না।

২) **প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব :** শিক্ষা পরিসেবা পাওয়ার জন্য যে পরিমান সম্পদের বিনিয়োগ হয়, আমাদের দেশে তার অভাব রয়েছে। বিদ্যালয় তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি, ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র ও উপকরণের প্রয়োজন হয়, তাছাড়া প্রয়োজন উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর। এসবের জন্য প্রয়োজন অর্থের, যার জোগান দরিদ্র পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী করতে পারে না। তাই সরকারী উদ্যোগে সম্পূর্ণ গ্রহণ না করলে পশ্চাৎপদতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।

৩) **সম্পদের অসম বন্টন :** আমাদের দেশে তথা সমগ্র পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট সম্পদের সুষম বন্টন হলে কোনো মানুষ না খেতে পেয়ে থাকবে না, কাউকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করতে হবে না, সকলেই নূন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পেতে পারবেন। এটা হচ্ছে না বলেই এক লঘিষ্ঠ শ্রেণীর হাতে অধিকাংশ সম্পদ পুঞ্জিভূত হচ্ছে আর গরিষ্ঠ সংখ্যার মানুষেরা নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারছেন না।

৪) **বিপরীত সামাজিক সম্পর্ক :** সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল পারস্পরিক সহযোগিতায় নিজেদের বেঁচে থাকাকে সুগম করতে। মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধা ও সম্মানের, পারস্পরিক সহযোগিতার, বিশ্বাসের ও মর্যাদার। আধুনিক সমাজে সম্পর্কের এই ভিতটাই নড়ে গিয়েছে। পারস্পরিক বিশ্বাস আজ হারিয়ে গিয়েছে, সহযোগিতা পরিণত হয়েছে বিরোধিতায়। বিগত শতাব্দীর যৌথ পরিবার ভেঙে পড়েছে। অনিশ্চয়তা আজ নিত্য সঙ্গী। এই ধরনের সামাজিক সম্পর্ক অগ্রসরের সাহায্যে অনগ্রসর এগিয়ে যাবে এটাই মানুষ আজ বিশ্বাস করতে পারছে না।

শিক্ষার সংশ্লিষ্ট কারণসমূহ :-

১) **নিরক্ষরতা :** পশ্চাৎপদতার অন্যতম মুখ্য কারণ নিরক্ষরতা। শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে, আর শিক্ষার প্রধান বাহন হল স্বাক্ষরতা। শিক্ষাই মানুষকে সম্পদে পরিণত করে ও সে তার নিজের যোগ্যতা উপলব্ধি করতে পারে।

২) **উপযুক্ত মানের শিক্ষালয়ের অপ্রতুলতা :** পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিভিন্ন কারণে যথেষ্ট পরিমানে ও উপযুক্ত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব এখনও পর্য্যন্ত রয়ে গেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যার অপ্রতুলতা ও যাতায়াতের অসুবিধার কারণে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা হয়নি। কোন কোন অঞ্চলে শিক্ষালয় থাকলেও সেটি হয়ত সমস্ত শিশুর পক্ষে সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। তাছাড়া, প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় শিক্ষালয় থাকলেও পরবর্তী স্তরের প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক দূরে অবস্থিত থাকায়, শিশুরা, বিশেষত বালিকারা তার সুবিধা নিতে পারে না।

৩) **অনুন্নত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস :** ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে সমস্ত অঞ্চল, বিশেষত গ্রামাঞ্চল, বনাঞ্চল ও পাহাড়িয়া অঞ্চল সমূহ এখনও পর্য্যন্ত আর্থ-সামাজিক দিক থেকে উন্নত হয়ে উঠতে পারেনি। দুর্গমতার কারণে সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয়। দুর্গমতার কারণে সেখানে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাজার হাট গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিক থেকেও অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

সামাজিক কারণসমূহ :

১) **অস্পৃশ্যতা :** অস্পৃশ্যতা ভারতীয় সমাজের একটি ব্যাধি। এর দ্বারা জন্মসূত্রে একশ্রেণীর মানুষ দীর্ঘকাল ব্যাপী সমাজের অন্য শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সমস্ত ধরনের সামাজিক সুযোগ থেকে এঁরা বঞ্চিত। এসব পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিকতা, বিনোদনসহ সমস্ত সাধারণ সুযোগ সুবিধায় সমসুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। দীর্ঘদিন বঞ্চিত থেকে এঁরা হীনমন্যতার শিকার হয়ে নিজেদের প্রাপ্য মানবিক অধিকার দাবি করার কথা ভাবতেও পারেন না।

২) **ধর্ম ও রক্ষণশীলতা :** আমাদের দেশে ধর্ম একটি বড় সামাজিক শক্তি। সমাজ বিবর্তনের ধারায় এক সময় সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। কালক্রমে সেই ধর্ম মানুষের মধ্যে ক্রমশ সংস্কারের জন্ম দিয়েছে, যাকে অতিক্রম করে সকলকে এক জায়গায় বসানো আজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কার চেতনার মুক্তিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩) **সামাজিক প্রথা :** দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত নানা সামাজিক প্রথা সর্বজনীন মুক্ত শিক্ষার প্রসারে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। যেমন নারী শিক্ষার প্রসার দীর্ঘদিন আটকে ছিল সামাজিক কারণে। এখনও পশ্চাৎপদ অংশের বেশিরভাগ মানুষ নারীশিক্ষার পক্ষপাতী নন।

৪) **উচ্চশিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তির অপ্রতুলতা :** আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে স্বাভাবিক কারণেই উচ্চশিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তির সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম থাকে। ফলে শিক্ষা ও সচেতনতা বিস্তারের দিক থেকেও এই সব অঞ্চল যথেষ্ট পিছিয়ে থাকে। যতাযথ শিক্ষিত ও চেতন ব্যক্তিরাই সমাজের অনগ্রসরতা সম্পর্কে অন্যদের সচেতন করে উন্নয়নের দূত হিসাবে কাজ করেন।

৫) **গতানুগতিক জ্ঞান ও কৃৎকৌশলের ব্যবহার :** পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী নিরক্ষর বা কম শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রাচীন ও গতানুগতিক সংস্কার ও প্রথাকে আঁকড়ে ধরে থাকেন এবং জ্ঞান ও কৃৎকৌশলকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রাখেন। ফলে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফলের মাধ্যমে উন্নয়ন তাদের কাছে পৌঁছায় না।

৮.৬ঃ পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের উপায় সমূহ

পশ্চাৎপদতা আইন প্রনয়নের মাধ্যমে হঠাৎ করে বন্ধ করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও যথাযথ ব্যবস্তা গ্রহণ। নিম্নরূপ পরিকল্পনা ও তার সঠিক রূপায়ন আমাদের দেশ থেকে পশ্চাৎপদতা দূর করতে পারে।

১) শিক্ষার প্রসার :

শিক্ষা আনে সচেতনতা। শিক্ষা মানুষকে আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করে কর্মক্ষম করে তোলো। তাই পশ্চাৎপদ এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পশচাৎপদ জনসাধারনের মধ্যে কার্যকরী শিক্ষার প্রনয়ন এবং সেগুলির যথাযথ রূপায়ন। শিক্ষার প্রসারের জন্য নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরোপ করা প্রয়োজন—

ক) **পশ্চাৎপদ এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপন :** বিদ্যালয়ের অভাব শিক্ষাপ্রসারের অন্যতম কারণ। ছোট ছোট শিশুরা শিক্ষার শুরুতে দূরবর্তী স্থানের শিক্ষালয়ে যেতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাস্তাঘাট ও যানবাহনের অভাব থাকে।

খ) **প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ :** প্রত্যক্ষ ও পশ্চাৎপদ এলাকাগুলিতে বিদ্যালয় থাকলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক পাওয়া যায় না। তাই শিক্ষার্থী সংখ্যার আনুপাতিক হারে শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন। আমাদের দেশে শিক্ষার প্রায় সমস্ত স্তরেই উপযুক্ত মানের শিক্ষকের অভাব প্রকট। এই অভাব দূর করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

গ) **বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের উপযুক্ত পরিকাঠামো সৃষ্টি :** বিদ্যালয়ের উপস্থিতিই শিক্ষা প্রসারের উপায় নয়, সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার। সঠিক মাপের আলো-হাওয়া যুক্ত শ্রেণীকক্ষ, বসার আসন, প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরন, পরিশুদ্ধ পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা ইত্যাদি গড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে।

ঘ) **আর্থিক অনুদান :** পশ্চাৎপদ এলাকায় বসবাসকারী দারিদ্র সীমার নীচের পরিবার গুলির শিশুরা শিক্ষালয়ে যেতে না পারার অন্যতম কারণ পরিবারের আর্থিক অবস্থা। পড়াশুনা খেলাধুলার সময়ে শিশুকে দুবেলা খাবারের সংস্থানের জন্য শ্রমদান করতে হয়। এইসব কারণে পশ্চাৎপদ এলাকাগুলিকে পরিবারের আর্থিক অবস্থানানুযায়ী সব শিশুদের শিক্ষার সমস্ত ব্যয় ভার রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বহন করলে পশ্চাৎপদতা দূরীকরণ সম্ভব হবে।

ঙ) **এলাকার সার্বিক উন্নয়ন :** উন্নয়ন পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের বড় হাতিয়ার। ভূমি ও শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কোন অঞ্চলের উন্নয়ন হয়। আর উন্নয়নের হাত ধরেই আসে মানুষের কর্মসংস্থান, যা তাদের আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তোলে। আর এই আর্থিক স্বনির্ভরতাকে অবলম্বন করে পশ্চাৎপদতা দূরীভূত হয়।

চ) **সমাজের মনোভাবের পরিবর্তন :** দীর্ঘদিনের প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক প্রথা, আচার-আচরন ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত ও প্রচলিত সামাজিক মনোভাব সমাজের পশ্চাৎপদ অংশের উন্নয়নের পথে

একটি বড়ো বাধা। এই সামাজিক মনোভাব পুষ্ট সমাজের অনগ্রসর অংশের মানুষ অনেক সময়ই পশ্চাৎপদতা দূরীকরনের বিভিন্ন পন্থা রূপায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘদিনের শোষন, বঞ্চনা ও অবহেলায় এই পশ্চাৎপদের যে অক্ষমতা, দ্বিধা ও জড়তা তৈরি হয়েছে তার দূরীকরন অগ্রসর অংশের সহৃদয় সহযোগিতা ছাড়া অসম্ভব।

ছ) **সাংবিধানিক রক্ষাকবচ :** অগ্রসর জনগনের সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না বলেই তাঁরা পশ্চাৎপদ। তাই চলার পথে তাঁদের জন্য প্রয়োজন নানা ধরনের রক্ষাকবচের। এগুলি হতে পারে — শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও চাকুরির ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে সংরক্ষণ, সামাজিকভাবে সমমর্যাদা প্রদান, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেযে সকল পশ্চাৎপদকে উন্নয়নের সুযোগ ইত্যাদি।

জ) **আইন প্রনয়ণ :** পশ্চাৎপদ অংশকে সামাজিক সুরক্ষা দিয়ে অগ্রসর অংশের সমকক্ষ করার জন্য প্রয়োজন যথাবিহিত আইন প্রনয়ণের। শুধুমাত্র কথার দ্বারা সমাজের শুভ বুদ্ধির উদয় কখনই হয়নি, আজও হবে না। তাই যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে তেমনি বিধি ও আইন প্রনয়নের প্রয়োজন আছে। আবার আইন প্রনয়ণ করলেই হবে না সেগুলি যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সুরক্ষা যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্যও বিধি বলবৎ করা প্রয়োজন।

ঝ) **তদারকি কমিশন/কমিটি :** পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মানুষদের উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত সাংবিধানিক রক্ষাকবচ, আইন ও বিধি প্রনয়ণ করা হয়েছে, সেগুলিকে নিয়মিত ও কার্যকরীভাবে তদারক করার জন্য কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয়স্তরে উপযুক্ত ক্ষমতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন তদারকি কমিশন/কমিটি নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই কমিশন/কমিটি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সরকারের কাছে নিয়মিত রিপোর্ট পেশ করবেন। উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ঞ) **সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়ন :** বৈচিত্র্যের নিরিখে আমাদের দেশ বিশাল। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির দিক থেকে অসংখ্য সংখ্যালঘু মানুষের বসবাস এই দেশে। প্রত্যেকের স্বাতন্ত্রতা ও স্বাভিমান বজায় রেখে ব্যবস্থা না নিলে সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্ভব। প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা তথা উন্নয়নের চাহিদাও পৃথক। এই পার্থক্যকে বিবেচনা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি ভীষন বাস্তব। প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রয়েছে তাদের নিজস্বতা — ভাষা ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রাখতে চান, অথচ সংখ্যাগুরু ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে শিক্ষাগ্রহণ ছাড়া তাঁদের কাছে বিকল্প থাকে না। তাই এই বিরোধের মীমাংসার মাধ্যমে সমন্বয় স্থাপন করেই তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা হতে হবে।

বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ :

আমাদের দেশের পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীগুলির সবার পশ্চাৎপদতা এক কারণে নয়। যেমন— তপশিলি জাতিভুক্ত গোষ্ঠীর পশ্চাৎপদতার প্রকৃতি ও কারণগুলি একধরনের, তপশিলি উপজাতিভুক্ত গোষ্ঠীগুলির পশ্চাৎপদতার প্রকৃতি ও কারণগুলি অন্য ধরনের, আবার বিভিন্ন অনগ্রসর সম্প্রদায়ের পশ্চাৎপদতার প্রকৃতি ও কারনগুলি বিভিন্ন প্রকারের। তাই বিভিন্ন ধরনের পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের উপায় ও পরিকল্পনাও হতে

হবে বিভিন্ন প্রকারের। যেমন — সাধারণভাবে তপশিলি জাতিভুক্ত ব্যক্তিগণ সমাজের মূল ধারায় বসবাস করায় ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে মূল ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় অসুবিধা বোধ করেন না। কিন্তু বিভিন্ন তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের ভাষা ও সংস্কৃতি পৃথক হওয়ার কারণে মূল ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁরা শুধুমাত্র অস্বস্তিবোধ করেন তাই নয়, তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি অবলুপ্তির আশঙ্কায় শিক্ষালয়ে সন্তান-সন্ততিদের পাঠাতে চান না। বিভিন্ন অনগ্রসর গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের মধ্যে সংখ্যালঘুদের সমস্যা এক ধরনের, অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসরদের সমস্যা আর এক ধরনের। তাই প্রয়োজন চাহিদানুযায়ী বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহনের এবং অবশ্যই যা হবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও নিয়ন্ত্রনে।

৮.৭ ঃ জাতীয় সংহতি কী? (National Intergration and Internationalisalion)

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন — ''ভারতের বা রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি যখন সংকীর্ণ ব্যক্তি চেতনা ও সমাজ চেতনাকে অতিক্রম করে একই আদর্শ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহানুভূতি গড়ে তুলতে পারবে, তখনই জাতীয় সংহতির সমস্যার সমাধান হবে এবং প্রাক্ষোভিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ ভৌগলিক সীমা ও উপজাতীয় আনুগত্যকে অস্বীকার করে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি জাগরিত হওয়াকে বলা হচ্ছে জাতীয় সংহতি (National intergration)।"

৮.৭.১ ঃ জাতীয় সংহতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

ভারতের জাতীয় সংহতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান কালে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়িয়েছে দুটি দিক থেকে। বর্তমানে বিশ্বসভ্যতার দ্বিমুখী প্রবণতা রাষ্ট্রকে জাতীয় সংহতির সমস্যার সমাধান দ্রুত খুঁজতে বাধ্য করেছে। এদের মধ্যে একটি হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ প্রবণতা। এই বিরোধের মোকাবিলা করার জন্য দরকার জাতীয়তাবাদের আদর্শ। দেশের প্রত্যেক মানুষ যদি একত্রে মিলেমিশে বাস করতে না শেখে, তারা যদি ঐক্যবদ্ধ না হয়, তাহলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারা যাবে না। তাই মানব সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রের অন্তর্গত সব শক্তির মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টাকে আরও ব্যাপক করার শক্তি দিচ্ছে। বর্তমান কালে প্রত্যেক চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রনীতিবিদ মনে করেন মানব সভ্যতার আরও অগ্রগতির জন্য চাই বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ। তাই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সে বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রিক সংহতি আনার প্রচেষ্টা চলছে। জাতীয় সংহতিকে উপেক্ষা করা যায় না। কারণ, সংহতি বা সমন্বয়ের প্রক্রিয়া তার স্বাভাবিক নিয়মে ক্রম পর্যায়ে অগ্রসর হয়। প্রথম ক্ষুদ্রতম অংশগুলির মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক বৃহত্তর সংগঠন তৈরী হয়, তারপর ওই অংশগুলি পরস্পরের মধ্যে সংহতি স্থাপনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর সংগঠন গড়ে তোলে। এইভাবেই অগ্রসর হয় সংহতির প্রক্রিয়া (Process of integration)। তাই আধুনিক যুগে অন্তঃরাষ্ট্রীয় সংহতির কথা বলা হচ্ছে, তখন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাথমিক সংহতি স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

৮.৭.২ ঃ ভারতের জাতীয় অসংহতির কারণ

বর্তমান ভারতের অসংহতির নানা কারণ দেখা দিচ্ছে। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—

১। **ধর্ম :** ভারতবর্ষে বহু ধর্মের মানুষ বাস করে, প্রত্যেকেই নিজের ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এই আনুগত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে নাগরিকগণ পরস্পরের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে ও তাহার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ভয়াবহভাবে বিভিন্ন আচরণের মধ্যে। এই ধরনের মনোভাবের ফলেই স্বাধীনতার মুহূর্তে ভারতবর্ষকে ভাগ করার প্রয়োজন হয়েছিল। ধর্মের প্রতি গোঁড়া মনোভাব এবং অন্ধ বিশ্বাস এই ধরনের অসংহতির জন্য দায়ী। স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরে, আজও দেশের জনগণ ধর্মের দোহাই দিয়ে অনেক অবাঞ্ছনীয় কাজে লিপ্ত হয়।

২। **বর্ণভেদ :** আবার, একই ধর্মীয় মানুষের মধ্যে ও বিভিন্ন বিভাগ বা উপশ্রেণী আছে। হিন্দুধর্মে বর্ণভেদের প্রথা আছে। এই প্রথা ভারতীয় রাষ্ট্রে বিভিন্ন নাগরিকদের মধ্যে বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন বিশেষ বর্ণের লোকের সামাজিক অনুষ্ঠানে অন্যবর্ণের লোকের প্রবেশ নিষেধ। এই ধরনের সামাজিক প্রথা পরস্পরের মধ্যে বিভেদমূলক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৩। **ভাষা :** ভাষা আর এক ধরনের অসংহতিমূলক উপাদান। ভাষার মাধ্যমেই মানুষ সাংকেতিকভাবে তার মনের ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ আছে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের মানুষের ভাষা বোঝে না। ফলে ভাবের আদান প্রদান ঠিকভাবে হয় না এবং এই কারণে তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয় না।

৪। **অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব :** অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব এবং জাতীয় আয়ের বিষম বণ্টন, বেকার সমস্যা, এই সমস্ত কিছু ভারতের বর্তমান যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে। এর ফলে তারা জীবন পরিস্থিতির সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এটিও অসংহতির একটা প্রধান কারণ। বেকার যুবক ও অনুন্নত শ্রেণীর ব্যক্তিদের মানসিক ক্ষোভ ভয়াবহ আকারে আচরণের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।

৫। **প্রাদেশিকতা :** যথাযথ নেতৃত্বের অভাবে আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্য পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করছে না। এই ধরনের সংকীর্ণ মনোভাবের জন্য আন্তঃরাজ্য বিরোধ দেখা দিচ্ছে এবং সেই বিরোধে সাধারণ নাগরিকগণ হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। এই ধরনের উগ্র প্রাদেশিকতা জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬। **নৈতিকমান :** সামগ্রিকভাবে জাতির নৈতিকমানের অবনতি জাতীয় সংহতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পারস্পরিক অবিশ্বাসের মনোভাব, পরস্পরকে প্রতারণা করার মনোভাব, অসদুপায়ে অর্জনের চেষ্টা— এ সমস্ত কিছু এই নৈতিক মানের অবনতির ফল এবং এর ফলে নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের মনোভাব সব সময় জাগরুক থাকছে।

৭। **নিরক্ষরতা :** সবশেষে, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, নিরক্ষরতা এই জাতীয় সংহতি স্থাপনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার দ্বারা যথার্থ নাগরিকতার শিক্ষা হচ্ছে না, ফলে সুস্থ নাগরিক জীবনের যেসব বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার, তা শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।

মন্তব্য : জাতীয় জীবনের এই সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে না পারলে, জাতীয় সংহতির সমস্যা চিরদিনই থেকে যাবে। তাই জাতীয় সংহতির সমস্যাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমাধান করতে হলে এই সমস্যাগুলি সার্থক সমাধানের মাধ্যমেই অগ্রসর হতে হবে। সার্বভৌম শাসন ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপন করলে এবং বিভিন্ন জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে কতকগুলি আইন গঠন করলেই অসংগতিকে দূর করা যাবে না। গতানুগতিক চিন্তাধারার পরিবর্তন করতে হবে মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে প্রক্ষোভমূলক ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে জাতীয় সংহতি স্থাপন করার কাজ সঠিক পথে অগ্রসর হবে।

৮.৭.৩. ঃ জাতীয় সংহতি ও শিক্ষা

শিক্ষাই একমাত্র উন্নত ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি স্থায়ী পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। জাতীয় সংহতির যেসব বাধা আছে, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার প্রত্যেকটির মূলে আছে শিক্ষার অভাবজনিত অজ্ঞতা।

শিক্ষা হল এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া। তার দ্বারা সমাজের প্রয়োজন ও সাধিত হবে। এখন বর্তমান সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন যদি হয় জাতীয় সংহতি স্থাপন করা, তাহলে শিক্ষাকে স্বাভাবিকভাবে সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ কে.এল. শ্রীমালী বলেছেন— "If we are convinced that in the present state of our development, we must make a deliberate effort to develop national consciousness among our people, it is a legitimate demand that our educational system should be geared to fulfil this purpose...... Education must make the growing youth realize that they are in disolubly bound to the nation and its destiny, its tragedies and joys, its conflicts and settlements, its failures and achievements, its mistakes and wisdoms and they should come to regard it with pride and with love and the impelling desire to serve it whole heartedly. "

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় সংহতির সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই গুরুত্বের কথা ভারতের প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তাবিদ্ উপলব্ধি করেছেন। ১৯৫৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে এক আলোচনাচক্রে ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্গণ যোগ দেন। সেখানে তাঁরা প্রত্যেক জাতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য শিক্ষার গুরুত্বের কথা স্বীকার করেন। যদিও তাঁদের আলোচনা বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমবদ্ধ ছিল, তবুও তা সাধারণভাবে সর্বস্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরে এই আলোচনা চক্রের ফলাফলকে কার্যকর করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয় এবং তাঁরা জাতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য শিক্ষাকে কীভাবে পরিচালনা করা যায়, সে সম্পর্কে সুপারিশ করেন। তাঁদের এই সুপারিশগুলি উল্লেখ করলে জাতীয় সংহতির জন্য শিক্ষাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তার পথ নির্ধারণ করা যাবে।

৮.৭.৪ ঃ জাতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য শিক্ষার পুনর্বিন্যাস Reorganisation of Education for National Integration :

জাতীয় সংহতি স্থাপন করতে হলে সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করার দরকার এবং সম্পূর্ণ শিক্ষাকে ওই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আয়োজিত আলোচনা চক্রে যে পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল—

১। **অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ :** জাতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হবে এবং এই ধরনের বৈষম্য দূর করে প্রত্যেককে যথাযোগ্য বিকাশের সমান সুযোগ দিতে হবে। এই সুযোগ দিতে হলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে যাতে জীবন উপযোগী প্রশিক্ষণ পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করতে পারে তার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আবশ্যিক করতে হবে। শিক্ষার্থীগণ যাতে এই স্তরে নির্দিষ্ট বৃত্তিমূলক প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

২। **পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন :** বিভিন্ন রাজ্যে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের সময় বিশেষ যত্ন নিতে হবে। যে সকল পুস্তকের বিষয়বস্তু জাতীয় সংহতি স্থাপনের উপযোগী মানসিকতা গঠনে সহায়তা করবে সেই জাতীয় পুস্তক নির্বাচন করতে হবে। যদি কোন বিশেষ পুস্তক কোন বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিরুপ সমালোচনা করে, তাহলে সেই পুস্তক সবসময় ত্যাগ করতে হবে। সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যাপারে যদি সরকার একটি সর্বভারতীয় নীতি ঘোষণা করেন, তাহলে ভালো হয়। বর্তমানে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা (N.C.E.R.T) বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক রচনা করেছেন। এগুলিকে আদর্শ হিসাবে ধরে, বেসরকারি স্তরে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও নির্বাচন করতে পারলে ভালো হয়।

৩। **পাঠ্যপুস্তক রচনা :** জাতীয় সংহতি স্থাপনের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে এবং শিক্ষার্থীগণ সেগুলি যাতে সহজে সংগ্রহ করতে পারে, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই ধরনের পাঠ্যপুস্তকে মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার বিভিন্ন কাহিনী থাকবে। এই পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্য হবে, শিক্ষার্থীদের সংহতির, শিক্ষার্থীদের সংহতির উপেযোগী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

৪। **গণশিক্ষা :** শিক্ষালয়ের মাধ্যমে গণশিক্ষার ব্যবস্থা ও করতে হবে, যাতে করে অশিক্ষিত বয়স্কদের সঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তিদের কোন বিভেদের মনোভাব সৃষ্টি না হয়। শিক্ষালয় থেকে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকগণ যদি সপ্তাহে একদিন করে পাশ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়ে জনসংযোগ করেন এবং সাধারণ বিষয়ের উপর বক্তৃতার আয়োজন করেন, তার ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও অনেকাংশে দূর হবে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের সংযোগ স্থাপিত হবে। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে, সমাজ সেবামূলক কাজকে আবশ্যিক করা হয়েছে। এই পাঠ্যক্রম সঠিকভাবে অনুসরণ করলে জাতীয় সংহতি স্থাপনের কাজে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যাবে, এ আশা পোষণ করা যেতে পারে।

৫। **জাতীয় দিবস পালন :** বিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস পালনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই জাতীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জাতির প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব জাগ্রত হবে। বিভিন্ন জাতীয় নেতার জন্ম দিবস এবং বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক উৎসব ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক মমত্ববোধ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হবে এবং তার ফলে জাতীয় অসংহতি দূর করা যায়।

৬। **জনসংযোগ ব্যবস্থা :** সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিকারী অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে হবে যাতে জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে। এই সুপারিশকে কার্যকর করার জন্য ভারত সরকার নানা ব্যবস্থা করেছেন। এই সকল ব্যবস্থা নাগরিকদের চিন্তা জগতে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

৭। **ধর্মের গোঁড়ামি ত্যাগ :** বিদ্যালয়ের আচরণই পরবর্তী পর্যায়ে সমাজজীবনে সঞ্চারিত হবে। সুতরাং বিদ্যালয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে চলতে হবে এবং ধর্মভেদের নীতিকে বিদ্যালয় জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। এই ধরনের ব্যবস্থা সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করলে শৈশবকাল থেকেই শিক্ষার্থীদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে। ধর্মই ভারতীয় সমাজের ভিত্তি, তাই তাকে শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা যায় না। তাই শিক্ষাকে জাতীয় সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে হলে, বিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে, সেই শিক্ষার মধ্য দিয়ে যাতে ধর্মের গোঁড়ামি শিক্ষার্থীদের মনে সঞ্চারিত না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

Internationalisation :

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই শতক পর্যন্ত ছিল ঐক্যের ইতিহাস, এই ছিল সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য। তার পরের ইতিহাস ব্যতিক্রমী, এল বিশ্ব মহাযুদ্ধের কাল; সংঘাতের কাল; বিচ্ছিন্নতার কাল। উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকেই জন্ম নিল পর পর দুই বিশ্ব মহাযুদ্ধ। বিশ্বমানব সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হল— একদিকে উগ্র জাতীয়তাবাদ অপরদিকে গণতান্ত্রিক সমাজদর্শ। যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় হল বা কোন পক্ষের পরাজয় হল, সেটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল, এই ঘটনার ফলে মানব আত্মার মধ্যে সৃষ্ট, বিশ্বশান্তি, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, বিশ্ব নাগরিক, আন্তর্জাতিকতা ইত্যাদির চাহিদা। প্রত্যেক সুস্থ মানুষ নিজের বিবেকের তাড়নায় উপলব্ধি করল, মানুষের এই এতদিনের সভ্যতাকে, এত কষ্টার্জিত কৃষ্টিকে সাময়িক উত্তেজনার বশে সংকীর্ণ স্বার্থে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেওয়া যায় না। অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ভীতি এবং ধ্বংসের আশঙ্কা সকল শ্রেণীর মানুষকে ভাবিত করল। প্রত্যেক সুস্থ চিন্তাশীল মানুষ নিজের বিবেকের তাড়নায়, বিশ্ব শান্তির, বিশ্বমৈত্রীর এবং আন্তর্জাতিক প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের আওয়াজ তুলল। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষা নয়, কোন বিশেষ চিহ্নিত সমাজ বা রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা নয়। সামগ্রিকভাবে বিশ্বমানব কল্যাণই আজ সকলের কাম্য।

এমনভাবে বিংশ শতাব্দীতেই জন্ম নিল আন্তর্জাতিকতার মনোভাব, মানব সভ্যতার বিবর্তনের সর্বশেষ পরিণতি হিসাবে। মানব সমাজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপলব্ধি করল যুদ্ধ এবং কলহের দ্বারা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধের মিমাংসা সম্ভব নয়। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে একমাত্র বোঝাপড়ার মাধ্যমে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মনোভাবের ভিত্তিতে আলোচনার মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। মানবমনের এই অনুভূতিকে বলা হয় আন্তর্জাতিকতাবোধ। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে নিজ সমাজকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা এবং বিশ্ব সমাজে নিজের সমাজের অবদান সম্পর্কে সচেতন হয়ে বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর জন্য সচেষ্ট হওয়াই হল আন্তর্জাতিকতাবোধের মূল ভিত্তি।

ইউনেসকো (UNESCO)-এর প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ ডঃ লিউইস্ (H.C. Lewis) বলেছেন— "International understanding is the ability to observe critically and objectively and appraise the conduct of men everywhere to each other, irrespective of the nationality, of culture to which they may belong.” অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতাবোধ হল নিরপেক্ষভাবে অন্যব্যক্তির আচরণ পর্যালোচনার ক্ষমতা এবং এই বোধ জাগ্রত করতে হলে প্রত্যেক মানুষকে তার নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কারের প্রভাবমুক্ত হয়ে, সমস্ত সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে, অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের নৈর্ব্যক্তিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে।

৮.৭.৫ ঃ শিক্ষা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ

আন্তর্জাতিকতার বোধ বিকাশে শিক্ষার গুরুত্বের কথা বর্তমান কালে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীকার করেন। আন্তর্জাতিকতাবোধ অন্তরের অনুভুতি। মানুষ মনে প্রাণে যদি এই আদর্শকে বিশ্বাস না করে, তবে তার কর্মের মধ্যে প্রকাশ ঘটবে না। তাই মানুষের মধ্যে এই মানবীয় বোধের আদর্শ জাগ্রত করতে হলে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। সকল মানুষের মধ্যে যদি এই বোধ জাগ্রত করতে না পারা যায় তাহলে আন্তর্জাতিকতাবোধ তাদের মধ্যে জাগ্রত হবে না। এই বিশ্ব নাগরিকতার বোধ উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই জাগানো যায়। তাই প্রত্যেক শিক্ষাবিদ এবং চিন্তাবিদ শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ইউনেসকো (UNESCO) থেকেই নানাধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা করা হচ্ছে শিক্ষাকে আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে সংগঠিত করার জন্য। শিক্ষার মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক সচেতনতা আনা যায়। আর এই সচেতনতার মাধ্যমে সমবেদনামূলক মনোভাব গড়ে উঠবে বিশ্বের সকল নাগরিকদের জন্য।

অপর একটি দিক থেকে বিচার করতে গেলেও দেখা যায়, এই সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার উপর এসে পড়ে। শিক্ষা হল একধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া। সুতরাং সেদিক থেকে তার দায়িত্ব হল পরিবর্তনশীল সমাজ পরিবেশে ব্যক্তিকে অভিযোজনের ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা। বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের অনুকূলে, তখন শিক্ষাকে তা বাস্তব রূপদানের ব্যবস্থা করতে হবে। তাই ইউনেসকো (UNESCO) প্রকাশিত এই সম্পর্কিত এক পুস্তিকায় বলা হয়েছে— “Education like any other institution of social purpose to fulfil and must therfore, serve always the changing and increasingly complex needs of the modern world.” রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার মধ্যে এই মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করাকে তিনি শিক্ষার মহান দায়িত্ব হিসাবে বিবেচনা করেছেন। আর এই উদ্দেশ্যেই তিনি বিশ্বভারতী স্থাপন করেছিলেন। সুতরাং ‘আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টির জন্য শিক্ষা’ আধুনিক শিক্ষার একটি একান্ত প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে।

৮.৭.৬ ঃ আন্তর্জাতিকতার জন্য শিক্ষার মূলনীতি

শিক্ষাকে আন্তর্জাতিকতাবোধ বিকাশের জন্য কাজে লাগাতে হলে সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। কারণ, উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন করা যায় না। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় আন্তর্জাতিকতাবোধ বিকাশ করা, তাহলে বিশেষ কতকগুলি মূলনীতি সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। এই মূলনীতিগুলির কথা স্মরণ রেখে আমাদের কাজে অগ্রসর হতে হবে।

১। **নিরপেক্ষ চিন্তনের বিকাশ :** সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে চিন্তা করার অভ্যাস গঠিত হলে দেশের যুবক সম্প্রদায় অনুভব করবে বিশ্বশান্তিই একমাত্র উন্নতির পথ; দ্বন্দ্ব ও কলহের মাধ্যমে সভ্যতার অগ্রগতি হতে পারে না। যখন তারা সংস্কারমুক্ত ভাবে যেকোনো সমস্যার সমাধান করতে শিখবে তাদের মন থেকে সংকীর্ণতা দূর হবে। তাই আন্তর্জাতিকতার বোধ জাগ্রত করতে হলে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।

২। **প্রয়োগমূলক জ্ঞান :** শুধুমাত্র তত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের দিলে চলবে না, তাদের প্রয়োগ মূলক জ্ঞানও দিতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের সামনে জীবনের আদর্শগুলি তুলে ধরলে চলবে না; শিক্ষার্থীরা যাতে সেগুলি প্রয়োগ করতে পারে, তার সুযোগ করে দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় ও নৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে শুধু পাঠ গ্রহণ করবে না, ওই সকল তত্ত্ব নির্ভর আদর্শের অনুসরণে জীবন যাপন করতে শিখবে এবং অন্যের ধর্মকে সহনশীলতার সঙ্গে উপলব্ধি করতেও শিখবে। অন্যের ধর্ম বিশ্বাস, জীবনাদর্শ ইত্যাদিকে বিচার বিবেচনার দ্বারা উপলব্ধি করতেও শিখবে। অন্যের ধর্ম বিশ্বাস, জীবনাদর্শ ইত্যাদিকে বিচার বিবেচনার দ্বারা উপলব্ধি করে তার প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে উঠলে আন্তর্জাতিকতারবোধ সৃষ্টি হবে।

৩। **সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ দূরীকরণ :** শিক্ষার মাধ্যমে উগ্র জাতীয়তাবাদকে দূর করতে না পারলে আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগ্রত হবে না। শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণ ধারাকে পরিবর্তিত রূপ দিতে হবে। দেশের প্রতি ভালোবাসা, মানবতাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মানবতাবোধের পরিধিকে শিক্ষার মাধ্যমে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে বিশ্বমানবতাবোধে। বিশ্বমানবাত্মাকে শ্রদ্ধা করতে না শিখলে, আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির বোধ জাগ্রত হবে না।

৪। **পারস্পরিক ভয় দূরীকরণ :** ব্যক্তির ও জাতির মন থেকে ভয় দূর করতে হবে। প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে সন্দেহের চোখে দেখে। এর ফলে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা চলতে থাকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন মনোভাব জাগ্রত করা যায় দ্বারা সে মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখবে। পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব জাগিয়ে তুলতে পারলে আন্তর্জাতিকতার বোধ জাগবে।

৫। **স্বাধীনতার আগ্রহ :** আধুনিক যুগে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকারী। পৃথিবীতে সকলের স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে, তাই আন্তর্জাতিকতা বিকাশে সহায়তা করবে।

৬। **আদর্শমূল্যবোধ জাগরণ :** শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আদর্শ মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারলে সুস্থ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে। জীবনের উচ্চ আদর্শ সকল সমাজেই প্রায় সমান। সকল রাষ্ট্রের মানুষ মানুষই। তার নিজস্ব জীবনের যে আদর্শগুলি আছে, যে মানবীয় সুপ্ত সত্তা তার মধ্যে আছে, তা সর্বক্ষেত্রেই সমান। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সেই সুপ্ত মানবীয় উপাদানগুলিকে জাগ্রত করা।

এই মূল নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালনা করলে শিক্ষার দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের পথ সুগম হবে। এসম্পর্কে UNESCO ও এক মত। আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে এই বিষয়ে যে শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে, তাতেও এই সব নীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৮.৭.৭ঃ শিক্ষালয় ও আন্তর্জাতিকতাবোধের শিক্ষা (School and the Education for International Understanding) :

মূলনীতিগুলি শুধু ঠিক করলে চলবে না, তাদের কার্যকরীও করতে হবে শিক্ষালয়ের মাধ্যমে। শিক্ষালয় তার কার্যসূচী এমনভাবে পরিচালনা করবে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ হয় এবং তার দ্বারা আন্তর্জাতিকতার বোধ জাগ্রত হয়। এ কমসূচী সফল করার জন্য শিক্ষালয়কে দুটি দিক থেকে কার্য

পরিচালনা করতে হবে। যেসব মানসিক গুণ সংকীর্ণ, সেগুলিকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে এবং অন্যদিকে যেসব গুণ আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বভাব জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে সেগুলির বিকাশ করতে হবে চর্চার মাধ্যমে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষালয়ের গতানুগতিক দায়িত্বের পুনর্বিন্যাস করে তার কর্মসূচীর মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষালয়ের কাজ কী করলে ভাল হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল —

১। **পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পুনর্বিন্যাস :** শিক্ষালয়ের দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ও প্রাক্ষোভিক জীবনের বিকাশ সাধন করা। এই দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে শিক্ষালয়ের প্রধান কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বশান্তির অনুকুল মনোভাব সৃষ্টি করা। শিক্ষালয়ে নির্বাচিত বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিশ্ব মনুষ্য সমাজের যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। সুতরাং পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিষয়ের আলোচনা এমনভাবে করতে হবে যাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সম্পর্কে শিক্ষার্থীর কোন অজ্ঞতা না থাকে বা তাদের সম্পর্কে সে নিষ্ক্রিয় মনোভাব না পোষণ করে।

২। **শিক্ষালয়ে বিভিন্ন কার্যাবলীর পরিচালনা :** শিক্ষালয়ে বিভিন্ন সহ পাঠ্যক্রমিক কর্মসূচীর মাধ্যমেও আন্তর্জাতিকতার বোধ বিকাশ করা যায়। বিভিন্ন ধরনের কৃষ্টিমূলক কার্যাবলীই প্রধান। যেমন, পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীদের জন্মদিবস পালন করা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা যেমন— রাষ্ট্রপুঞ্জ দিবস, মানবাধিকার দিবস ইত্যাদি পালনের মধ্য দিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের যে বিভিন্ন চেষ্টা চলছে, তার সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হতে পারবে।

৩। শিক্ষালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা উচিত। এতে অন্যদেশের নাগরিকদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ঘটবে।

৮.৮ ঃ সারসংক্ষেপ (Summing up)

যে সমাজে প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার আছে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশে কোনোরকম বাধার সৃষ্টি করা হয় না, সেই সমাজেই সমসুযোগ আছে বলা হয়। ভারতীয় সংবিধানে সকল নাগরিককে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে। সাংবিধানিক অধিকার থাকলেও ভারতীয় সমাজে সমস্ত দিক থেকে বৈষম্য বর্তমান। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাংবিধানিক অধিকার থাকলেও বাস্তব অবস্থা সেই অধিকার প্রয়োগ করার পথে অন্তরায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার সমান অধিকার। শিক্ষা শুধু কতকগুলি মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে ধনী সুবিধাভোগী ও বঞ্চিত দরিদ্রের পার্থক্য কমিয়ে আনতে হবে। সমাজের প্রত্যেকটি সম্প্রদায় শিক্ষার সমান সুযোগ পাবে।

আজও ভারতে যাদের বেশী অর্থ আছে তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হয়। অর্থের অভাবে মেধাবী হয়েও বহু ছাত্র পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। শিক্ষার মধ্যে বৈষম্য থাকার ফলে সমাজে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এর ফলে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে।

সুতরাং দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এবং গণতান্ত্রিক মূলবোধ রক্ষার জন্য শিক্ষাগত সুযোগের সমীকরণ প্রয়োজন। শিক্ষার সমসুযোগ সৃষ্টির জন্য যেসব শ্রেণীর মানুষের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে সেগুলি হল— (১) নারীদের জন্য শিক্ষা, (২) তপশিলি ও উপজাতিদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা,

(৩) প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা। জাতীয় সংহতি ও আন্তজার্তিকতার জন্য শিক্ষার মূলনীতিকে অবলম্বন করে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করাই হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষালয় তার কার্যসূচী এমনভাবে পরিচালনা করবে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ হয় এবং তার দ্বারা আন্তর্জাতিকতারবোধ জাগ্রত হয়।

৮.৯ ঃ প্রশ্নাবলী (Questions)

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। শিক্ষার সমসুযোগ বলতে কী বোঝেন?
২। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য কী?
৩। জাতীয় সংহতি বলতে কী বোঝেন?
৪। গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী?
৫। পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী কাদের বলা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। পশ্চাৎপদতার কারণ আলোচনা করুন।
২। জাতীয় সংহতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কী?
৩। তপশিলি জাতিদের শিক্ষায় সমসুযোগদানের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?
৪। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় সমসুযোগ তৈরী করতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?
৫। ভারতবর্ষে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পশ্চাৎপদতার সামাজিক কারণগুলি বর্ণনা করুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। আমাদের দেশে শিক্ষায় সমসুযোগ সৃষ্টির জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা বর্ণনা করুন।
২। আন্তর্জাতিকতার জন্য শিক্ষার মূলনীতিগুলি বর্ণনা করুন।
৩। জাতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য শিক্ষার পুনর্বিন্যাস আলোচনা করুন।
৪। ভারতে জাতীয় অসংহতির কারণগুলি আলোচনা করুন।
৫। পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের গুরুত্বপূর্ণ উপায়সমূহ পর্যালোচনা করুন।

References :

1. Mathur S.S., Sociological Approach to Indian Education
2. Mahanti J., Indian Education in the Emerging Society
3. Chaube, S.P., Philosophical and Sociological Foundation of Education
4. শিক্ষার দার্শনিক ও সমাজ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি — ডঃ সনৎ কুমার ঘোষ।
5. শিক্ষার দার্শনিক ও সামাজিক ভিত্তি — ড. উজ্জ্বল পাণ্ডা, ড. মিহির চট্টোপাধ্যায়, ড. স্বপন সেন।
6. শিক্ষা ও সাম্প্রতিক সমস্যাবলী — ড. জয়ন্ত মেটে, ড. বিরাজ লক্ষী ঘোষ, ড. রুমা দেব।